দর্পণ

গল্প অনেক রকম শোনা যায়। তার ভেতরে যেটা সব চেয়ে চালু—অর্থাৎ লোকে শুনতে শুনতে প্রায় সত্যি বলেই মেনে নিয়েছে, সেটা সংক্ষেপে এই রকম।

খুব ঘটা করে অভিনয় হচ্ছিল সেদিন। এমন কি স্বয়ং ইংরেজ পুলিশ সাহেব পর্যন্ত থিয়েটার দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু প্রথম অঙ্ক শেষ হতেই গট্ গট্ করে বক্স থেকে বেরিয়ে গেলেন পুলিশ সাহেব। রাগে তাঁর টকটকে লাল মুখ প্রায় ফেটে পড়বার উপক্রম। হাতের কালো পালিশ ছড়িখানা ঘোরাতে ঘোরাতে সাহেব সোজা গিয়ে ঢুকলেন গ্রীণরুমে।

—কোথায় ম্যানেজার? আমি এক্ষুণি তাকে অ্যারেষ্ট করব।

নাকের এক পাশে একটা ক্রেপের গোঁফ লাগাতে লাগাতে ছুটে এলেন ম্যানেজার সদাশিব ঘোষ। তাঁর হাঁটু দুটো তখন থর-থর করে কাঁপছে—চোখ-দুটো ঠিকরে পড়বার উপক্রম। খাঁটি পৌরাণিক ভক্তিরসের নাটক—এর মধ্যে রাজদ্রোহের ছিটেফোঁটা আছে বলেও তো কেউ কল্পনা করে নি।

সদাশিব বললেন, স্যার—

—নো স্যার! তোমাকে এক্ষুণি থানায় যেতে হবে—এই বলে সাহেব নিজের জুতোর ওপরে ছড়িটা ঠুকতে লাগলেন। ভাবটা এই: দরকার হলে ছড়িখানা আরো হাত-দুই এগিয়ে অন্য কিছুও ঠুকতে পারে।

সদাশিবের তখন প্রায় শ্বাস ওঠবার অতিক্রম। ধরাগলায় বললেন, কিন্তু স্যার, আমার অপরাধ—

সাহেব গর্জন করে উঠলেন: তোমার অপরাধ অমার্জনীয়। তুমি স্টেজে স্ত্রীলোক নামিয়ে অভিনয় করাচ্ছ—সেজন্যে গভর্ণমেণ্টের কোনো অনুমতি নাওনি।

—স্ত্রীলোক! সদাশিবের ভয় এবার সীমাহীন বিস্ময়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল। সাহেব কি নেশা করে এসেছে নাকি? —কোথায় স্ত্রীলোক স্যার—কী বলছেন আপনি?

—আমার সঙ্গে চালাকির চেষ্টা কোরো না—সাহেব আবার হুঙ্কার ছাড়লেন: হোয়াট্ বেহুলা—হোয়াট্ উয়োম্যান—

বেয়াদবি হবে এ-কথা জেনেও সদাশিব হো-হো করে হেসে উঠলেন: বেহুলা, স্যার? হি ইজ নেভার এ উয়োম্যান স্যার। ওর নাম চারুচন্দ্র বিশ্বাস—রেগুলার দাড়ি কামায়।

—হোয়াট? ইজ ইট পসিবল? সাহেবের চোয়াল ঝুলে পড়ল। একজন পুরুষের গলার আওয়াজ ওই রকম হয়? হাঁটবার সময় ঠিক বাঁ পা এগিয়ে দেয়?—আই কান্‌ট বিলিভ ইট্।

—আমি ডাকছি স্যার—দেখেই চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন।

শুধু চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনই নয়—তারপরে সাহেব নাকি একটা সোনার মেডেলও দিয়েছিলেন চারুকে। বলেছিলেন, এমন আশ্চর্য অভিনেতা ইংল্যাণ্ডেও নাকি তিনি দেখেন নি।

লোকের মুখে চলে আসছে এই কাহিনী। কেউ কেউ আবার দু-এক পর্দা রঙও চড়িয়ে দেয় এর ওপরে। কিন্তু সত্যটা আর কেউ যাচাই করে না। সদাশিবের কাছে নয়, চারুর কাছেও না। হয়তো সত্যের ছোঁয়ায় গল্পের রঙটা ফিকে হয়ে যাবে—এই ভয়ে।

কিন্তু এমনটা যে হতে পারে—হওয়া সম্ভব, চারুকে দেখে সন্দেহ মাত্র থাকে না তাতে। মেয়েলী কথাবার্তা চারুর—মেয়েলী চাল-চলন। লোকে ঠাট্টা করে চারুবালা বলে। একটা ব্যাঙ্কে কেরানীগিরি করে—সদাশিব সেখানকার বড়বাবু। কাউন্টার-ভর্তি অসংখ্য লোকের সামনে এসেই হয়তো ফট্ করে বলে বসেন, এই চেকটা তাড়াতাড়ি পেমেন্ট করে দাও তো ম্যাডাম—বড় দরকারী।

চারু রাগ করে না। সহকর্মীরা কেউ কেউ যখন বৌদি বলে ডাকে তখনও না। এমন কি, সঙ্গে সঙ্গে পানের ডিবে খুলে এগিয়ে দেয় তাদের দিকে।

এ-হেন চারু শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে বসল।

বিয়ের খবরটা ছড়াবার মুখে অবশ্য ঠাট্টা-তামাসা করেছিল সবাই। অজস্র বেয়াড়া রসিকতা করেছিলেন সদাশিব।

—এটা কী করছ চারু, এ কী হচ্ছে? তোমার যে একজন পুরুষ মানুষকে বিয়ে করা দরকার।

বিয়ে রংপুরে। কাছাকাছিই। মস্ত বরযাত্রীর দল গেল সঙ্গে। সারা রাস্তা সমানে হৈ-চৈ।

সদাশিব একখানা গান লিখে দিলেন। তার বিষয়বস্তু এই রকম: দিন-কাল সব বদলে যাচ্ছে আজ-কাল। এখন আর মেয়ে-পুরুষে বিয়ে হচ্ছে না। হচ্ছে পুরুষে-পুরুষে, কিংবা মেয়েতে-মেয়েতে। তাই আমাদের চারুবালা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমস্ত পথ সেটা কোরাসে গাওয়া হতে লাগল। বিয়ের বাসরে ওটা কীর্তন অথবা গজলের সুরে গাওয়া হবে, তাই নিয়ে গবেষণা করতে লাগলেন সদাশিব।

কিন্তু বিয়ের আসরে কারো আর বাক্‌স্ফূর্তি হ'ল না।

বধূ কমলার মুখের ঘোমটা যখন খুলে দেওয়া হ'ল—তখন থমকে গেল কোরাসের দলটা। এমন কি, যে সদাশিব চিরকাল শহরের সেরা রসিক বলে আখ্যা পেয়ে এসেছেন, তিনি পর্যন্ত মুখ খুলতে পারলেন না চট্ করে।

ঢ্যাঙা চেহারার মেয়ে কমলা, মাথায় প্রায় চারুরই সমান। সমস্ত মুখে প্রবীণ অভিজ্ঞতার একটা স্থির গাম্ভীর্য। চোখে কালো চওড়া ফ্রেমের কড়া চশমা। গরম লোহার ওপরে কয়েক ফোঁটা জল পড়বার মতো রসিকতার উৎসাহগুলো বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেল হাওয়ায়।

বন্ধুদের তরফ থেকে বেশ রংদার প্রীতি-উপহার ছাপানো হয়েছিল কিছু। একজন সেইটে বিলি করতে উঠছে, সদাশিব তার হাত চেপে ধরলেন।

—এখানে থাক। ফিরে গিয়ে হবে। বিদেশে ভদ্রলোকদের সামনে ও-সব ফক্কুড়িগুলো না করাই ভালো। ফেরবার পালাটাও তেমন আর জমল না। সন্ধ্যেবেলা ট্রেনে চেপেই সদাশিব একটা বাঙ্কে লম্বা হয়ে পড়লেন। জনকয়েক তাঁকে অনুসরণ করল। কয়েকজন নিরুদ্যমে তাস খেলায় ঘন্টাখানেক কাটিয়ে দিলে। বাকী সবাই বসে বসে দু'টিন সিগারেট ধ্বংস করলে, কয়েকটা জোর-করা রসিকতার বুদ্‌বুদ ফুটে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে গেল, তার পর এ-ওর ঘাড়ে কাঁধ রেখে শুরু করলে ঝিমুতে। শুধু জেগে বসে রইল চারু আর কমলা।

একবার ভীরু গলায় চারু বললে, তুমি শোবে না?

চশমার ওপর কয়েক কণা কয়লার গুঁড়ো পড়েছিল। শাড়ীর আঁচলে সেগুলো মুছতে মুছতে কমলা স্থির গলায় বললে, না—ট্রেনে আমার ঘুম আসে না। ইচ্ছে করলে তুমি শুয়ে পড়তে পারো।

ইচ্ছে চারুর খুবই করছিল—বিশেষ করে ছুটো দিনের ক্লান্তি আর অনিয়মে যেন সর্বাঙ্গ ভেঙে পড়ছিল তার। কিন্তু সাহস হ'ল না। আলোধরা ঝাপ্‌সা চোখ মেলে বাইরের চলন্ত অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল সে। পাশেই রাখা কমলার হাতখানা—তার সরু সরু আঙুলের গিঁটগুলোকে ভারী শক্ত মনে হ'ল চারুর।

মোটের ওপর চারুর সংসার বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে। বছর ছয়েকের বড় এক বোন ছিল—অনেকদিন মারা গেছে সে। ছোট একখানা ছিমছাম বাড়িতে সে আর তার মা। ব্যাঙ্ক থেকে শ' খানেক টাকা মাইনে পায়, চা-বাগানের কিছু শেয়ার আছে। চলে যায় এক রকম।

বাড়িতে পা দিয়েই গিন্নী হয়ে বসল কমলা। বাতে পঙ্গু চারুর মা এক বোঝা চাবি কমলাকে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন, বাঁচলাম। তার পর একখানা লাঠিতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পাশের বাড়িতে তাস খেলতে চলে গেলেন।

বেশ ভালোই কাটল দিন কয়েক। নতুন নেশার আমেজে মাসখানেক দিব্যি ডুবে রইল চারু। তার পর হঠাৎ একদিন বিপর্যয় কাণ্ড ঘটলো একটা।

শহরের ড্রামাটিক ক্লাবে আবার 'শাজাহান' নামানো হচ্ছে। যথানিয়মে পিয়ারার ভূমিকায় রিহার্সাল দিয়ে, বেশ খুশি মনে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে রাত এগারোটায় চারু বাড়িতে এসে পৌঁছুল।

এ সময়ে মা কোনো দিন জেগে থাকেন না—একটা কোনো বই খুলে নিয়ে টেবিলের সামনে বসে বসে ঝিমোয় কমলা। আজ

ঘরে ঢুকে চারু দেখল, কমলা ঠায় বসে আছে, খুব মন দিয়ে একটা সেলাইয়ের কাজ করে চলেছে।

—আজ যে চোখ পুরোপুরি খোলা?—সহজ লঘু ভঙ্গিতে চারু জানতে চাইল।

কমলা সেলাই রেখে উঠে পড়ল। কঠিন শান্ত গলায় বললে, হাত-মুখ ধুয়ে এসো—খেয়ে নাও।

চমকে উঠে কুঁকড়ে গেল চারু। পলকের জন্যে দেখতে পেল, কমলার মুখের রেখায় রেখায় প্রবীণ-পরিণত গাম্ভীর্য—চোখে বেমানান কালো ফ্রেমের চশমা। সরু লম্বা লম্বা আঙুলের গিঁটগুলোকে অদ্ভুত শক্ত বলে মনে হ'ল একবার।

খাওয়া শেষ হ'ল প্রায় নিঃশব্দে। বিছানায় এসে কমলা বললে, একটা কথা আছে।

অজ্ঞাত আশঙ্কায় একবার দৃষ্টি তুলেই নামিয়ে ফেলল চারু। এত মোটা ফ্রেমের চশমা কেন ব্যবহার করে কমলা? হঠাৎ যেন মনে হয় ওর চোখ-ছুটো দেখা যাচ্ছে না—তাদের ওপর ছুটো কঠিন কালো পরকলা পরানো।

বিনা ভূমিকায় কমলা বললে, দত্তদের বাড়ি থেকে মেয়েরা এসেছিলেন।

—বেশ তো।

—পরশু ওঁদের বাড়িতে বিয়ে।

বালিশের রঙিন তোয়ালেটাকে এক মনে লক্ষ্য করতে করতে চারু বললে, জানি। ও-বাড়ির ছোট মেয়ে বিজুর বিয়ে।

—তা হবে।—কমলার গলার আওয়াজ আরো শক্ত হয়ে উঠতে

লাগল : বিচ্ছুই হোক কিংবা আরশোলাই হোক—ও বিয়েতে তুমি যেতে পাবে না।

বলে কি! যেন আকাশ থেকে পড়ল চারু। ভয় ভুলে গিয়ে বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইল কমলার মুখের দিকে। বিচ্ছুর বিয়েতে সে যেতে পারবে না—এমন একটা অসম্ভব কথাও কেউ কোনো দিন ভাবতে পেরেছে নাকি!

—সে কি কথা! ওরা যে আমাদের আপনার জন—দশ রাত্তিরের জ্ঞাতি। না গেলে চলবে কেন? সবাই বলবে কী?

—যা বলছে তার চাইতে বেশী আর কি বলবে। দশ রাত্তিরের জ্ঞাতি!—কমলার চোখ ঝক্ ঝক্ করে উঠল : ও-ভাবে যারা অপমান করে যায় বাড়ি বয়ে, তাদের সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা না রাখাই উচিত।

—অপমান! কি অপমান করে গেল বাড়ি বয়ে?—চারুর চোখ কপালে উঠল : ওরা তো সে-রকম লোক নয়।

কমলার মুখের প্রবীণ গাম্ভীর্য ক্রোধে আর বিরক্তিতে গুমোট হয়ে আসতে লাগল : ওরা কি-রকম লোক—সে তুমিই হয়তো ভালো জানো। কিন্তু তুমি না হলে মেয়েদের বাসর জমবে না, তুমি পরিবেশন না করলে খাওয়া হবে না মেয়েদের, তোমার নাম চারুদি'—এ-সব কথা যারা বলে যায়, তাদের সঙ্গে তুমি সম্বন্ধ রাখতে পারবে না।

চারু আবার হাঁ করে রইল কতক্ষণ। এ তো জানা কথা—এ-সবের জন্যেই তো চারুর সারা শহরে অসামান্য খাতির। এ থেকে এমনভাবে চটে যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে কমলার?

চারু হাসল : তাতে আর কী হয়েছে? ও তো সবাই বলে।

—সবাই বলে।—তিক্ত ক্রোধে দপ্ করে জ্বলে উঠল কমলা : আর তাই শুনে তোমার ভারী আত্মপ্রসাদ বোধ হয়, তাই না? ছিঃ—ছিঃ—তুমি কি মানুষ?

—কী আশ্চর্য, কমলা—

—আশ্চর্যই বটে।—মুখের কথাটা কমলা প্রায় থাবা দিয়ে কেড়ে নিলে, তার চোখ দুটো হারিয়ে গেল সেই কালো কঠিন পরকলার অন্তরালে : নইলে এ-সব শোনবার পরে হাসতে তোমার এতটুকুও লজ্জা করে না?

বিছানা ছেড়ে উঠে গেল কমলা—দুম দুম করে চলে গেল ঘরের বাইরে। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে এল চারুও। বারান্দার একটা থাম ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কমলা। আকাশে কৃষ্ণা পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে যাচ্ছে—উঠোনের দুটো লিচু গাছের ওপর থরথরিয়ে কাঁপছে বিবর্ণ আলো—গেটের গায়ে ছায়া-ছায়া আইভিলতায় ফিস্ ফিস্ করে কথা বলবার মতো চাপা আওয়াজ উঠছে একটা। কমলা সেদিকে তাকিয়ে একটা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে।

সেই মুহূর্তে চারুর মনে হ'ল, এত দিন পরে প্রথম মনে হ'ল, কোথায় যেন কী একটা আগাগোড়াই ভুল হয়ে যাচ্ছে তার। কিন্তু—

পরদিন সকালে উঠেই চারু বিছানার দিকে তাকালো।

কমলা নেই। কখন পাশে এসে শুয়েছিল সে টের পায়নি, কখন উঠে গেছে তা-ও জানে না। দুটো ব্যাপারই সম্পূর্ণ নতুন। হঠাৎ যেন নেশার ঘোর ভেঙে গেল চারুর। ঠিক কথা—এত দিন পরে কোথায় কী যেন একটা গোলমাল হয়ে গেছে।

দাড়ি-কামানো। বাজার করা। স্নান-খাওয়া সেরে অফিসে যাওয়া। সব রুটিনে বাঁধা প্রতিদিনের কাজ। এর ভেতরে কাল রাত্রে কমলার ব্যবহারটাকে ভালো করে ভেবে দেখবার সময় পেল না চারু। থিয়েটারের পার্ট ছাড়া আর কোনো কিছু নিয়ে ভাববার সময় কোনো দিনে পায়নি চারু—আজও পেল না।

কিন্তু কথাগুলো নতুন করে মনে পড়ল অফিসে আসবার পরে।

মফঃস্বল শহরের ব্যাঙ্ক—প্রথম ঘণ্টা দেড়েক পরে কাজ খুব বেশী থাকে না। মনের ভেতরে একটা বিষণ্ণ জিজ্ঞাসা জাগিয়ে চুপ করে বসে রইল চারু।

কী বলতে চায় কমলা? এত দিন পরে লজ্জা পাওয়ার মতো কী কারণ ঘটল তার? এই শহরে—শুধু এই শহরেই বা কেন, আশে-পাশে কোনো ড্রামাটিক ক্লাবেই এমন অ্যাক্‌টার নেই যে তার মতো ফিমেল-পার্ট করতে পারে! কত জায়গা থেকে কত বার ভাঁড়া করে নিয়ে গেছে তাকে, সেকেণ্ড ক্লাশে চড়িয়েছে, খাইয়েছে সোরাবজীর হোটেলে। শুধু পুলিশ সাহেব কেন—আরো পনেরো-বিশটা মেডেল পেয়েছে সে—তার মধ্যে তিনটে সোনার। ফিমেলপার্ট করতে করতে এম্‌নি হয়ে গেছে যে মেয়ে-মহলে তার অবারিত দ্বার। অথচ কমলা—

—পিয়ারা—পিয়ারা!—সদাশিব এসে ঢুকলেন। তিনি সুজার পার্ট করছেন।

হঠাৎ মুখ লাল হয়ে উঠল চারুর। ডাকটা কেমন বিশ্রী লাগল কানে।

—সব সময়ে ও-সব ভালো লাগে না শিবুদা। ও-গুলো ক্লাবের জন্যেই থাক।

—ব্যাপার কী?—সদাশিব চমকে উঠলেন, কিন্তু তরল সুরটাকে থামতে দিতে চাইলেন না : হঠাৎ এত অভিমান কেন মানিনী?

—রসিকতারও একটা সময়-অসময় আছে—টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল চারু—বেরিয়ে গেল বারান্দার দিকে। বিমূঢ় সদাশিব ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

ঝড়টা এল দু'দিন পরে।

আগের রাত্রে প্রায় তিনটের সময় ফিরেছিল চারু—একেবারে চোরের মতো। কমলাকে সে বাঘের চাইতেও ভয় করে—তার নিষেধের কথাও সে ভুলতে পারেনি। মনে মনে প্রতিবাদ অবশ্য ছিলই। সে যাবে না, অথচ বিচ্ছুর বিয়ে হয়ে যাবে—এ কল্পনাই করা চলে না! কমলার নিষেধটা নিছক পাগলামির খেয়াল ছাড়া কিছুই নয়।

কিন্তু বেলা যতই পড়ে আসতে লাগল, ততই শুরু হ'ল ছটফটানির পালা। বেশ তো—না হয় মেয়েদের আসরে সে বসবেই না; সে নাহলে পরিবেশন করার লোক জুটবে না তাও নয়। তাই বলে বিচ্ছুর বিয়েতে সে আদৌ যেতে পারবে না—এ কী করে হয়? কমলার এ-সব আবদারের কোনো মানেই হয় না। তা ছাড়া আত্মীয় যখন—সামাজিকতার দায়িত্বও তো রয়েছে একটা। যাবে—বিয়েটা দেখবে, চলে আসবে চট্ করে।

তবুও যথেষ্ট জোর পাচ্ছে না মনে। অদ্ভুত কঠিন কমলার দৃষ্টি। সেদিন কী ভাবে দাঁড়িয়েছিল বারান্দার থাম ধরে—কাছে গিয়ে একটা কথা পর্যন্ত বলবার সাহস হয়নি চারুর। সে যেন কমলা নয়—আর কেউ। আজো যদি—

অনিশ্চিত সংশয়ের ভেতরে চারু একটু একটু করে বাড়িয়

দিকেই পা বাড়াচ্ছিল, হঠাৎ পাশে একটা রিকশা থামল এসে। সদাশিব।

গায়ে সিল্কের জামা—তা থেকে আতরের গন্ধ। বললেন, একা যাচ্ছিলাম, ভালোই হ'ল—তোমাকেও পাওয়া গেল। নাও, উঠে পড়ো।

হৃৎপিণ্ড চমকে উঠল চারুর।

—কোথায় যেতে হবে?

—গাছ থেকে পড়লে যে। তোমারই কুটুমবাড়ি হে—দত্তদের ওখানে। নাও—উঠে পড়ো।

—কিন্তু—চারু একবার ঢোঁক গিলল: আপনিই যান সদাশিবদা'। আমায় এখন বাড়ি যেতে হবে—জামা-কাপড় বদলানো হয়নি—

—আবার জামা-কাপড় বদলাবে কি হে!—জিভে আর টাক্‌রায় একটা বিস্মিত আওয়াজ করলেন সদাশিব: গায়ে পাট-ভাঙা গরদের পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী ধুতি—

চারু চমকে উঠল। বেরুবার সময় নিজেই কখন বেশ একটু সেজে-গুজে বেরিয়েছে টেরও পায়নি। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে।

প্রাণপণে একবার আত্মরক্ষা করতে চাইল চারু—একবারের জন্যে কমলার গম্ভীর কঠিন মুখখানাকে ভেবে নিতে চাইল মনে মনে কিন্তু তার আগেই হাত চেপে ধরলেন সদাশিব।

—এসো, এসো—উঠে পড়ো—

তার পরে কোনো প্রতিজ্ঞাই আর টিকে রইল না চারুর। বাইরের বৈঠক থেকে কখন যে অন্তঃপুরের আসরে চলে গেল নিজেই টের পেল না সে। মেয়েদের ভিড়, শাড়ী, সুগন্ধি, গয়নার ঝলক,

হাসি আর গানের মাতলামি। নেশায় বুঁদ হয়ে রইল চারু—মেয়েলী গলায় গান গাইল, ঠাট্টা-তামাশায় জমাট করে রাখল আসর।

যখন ফিরে এল, তখন রাত তিনটে। পড়ন্ত চাঁদের মেটে-জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে ছাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতর। নেশা কেটে যাওয়ার অবসাদে ভীরু দুর্বল পায়ে চারু বাড়ি ফিরল।

চাকরটা সদর খুলে দিলে। শোয়ার ঘরের ভেজানো দরজা খুলে দুরু-দুরু বুকে ঢুকল চারু। বিছানার ওপরে বালিশে মুখ গুঁজে নিঃসাড়ে পড়ে আছে কমলা—ঘরে আলো জ্বলছে। ঘুমুচ্ছে কি জেগে আছে, ভালো করে বোঝা গেল না।

খুট্ করে চারু আলোটা নিবিয়ে দিলে। তারপর খাটের একেবারে কোণ ঘেঁষে শুয়ে পড়ল নিঃশব্দে।

মনে অস্বস্তি যতই থাক, ঘুম ভাঙল পরদিন ন'টার পরে।

আজ রবিবার, অফিসের তাড়া ছিল না। তবু ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই চারুর মনে হ'ল, সময় থাকতেই তার বুদ্ধিমানের মতো পালিয়ে যাওয়া উচিত। প্রত্যেক রবিবার সকালে মা কালী-বাড়িতে যান—আজও গেছেন নিশ্চয়। এখন আর কোনো আড়াল নেই তার আর কমলার ভেতরে, আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করবার মতো জায়গাও কোথাও নেই তার। সময় থাকতেই জামাটা গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়া দরকার।

কিন্তু কমলা সময় দিল না। একটা চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

মাথা নীচু করে চায়ে গোটা তিনেক চুমুক দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কমলা। তার পর শান্ত গলায় বললে, আজই আমাকে রংপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দাও।

চারুর হাত কেঁপে উঠল। এক ঝলক চা চল্‌কে পড়ল গায়ে।

কমলা বললে, মেয়েরা সব সইতে পারে। ছেঁড়া কাপড় পরতে পারে, দরকার হলে তিন দিন উপোস করে থাকতে পারে, কিন্তু মেয়েলী পুরুষকে সহ্য করতে পারে না। তার স্বামীকে যখন লোকে মেয়েমানুষ বলে ঠাট্টা করে, তখন অপমানে তার মাথা কাটা যায়।

বিবর্ণ মুখ তুলে চারু তাকালো। যে-জিনিসটা দু'দিন ধরে ঝাপসা কুয়াসার মতো মাথার ভেতরে ঘুরছিল, এইবারে সেটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে গেছে কমলার নিষ্ঠুর মুখ। শ্রদ্ধা-ভালোবাসার একটা সামান্য রেখা পর্যন্ত কোথাও নেই।

কমলা আবার বললে, এখানে আসবার পরেই কথাটা আমি শুনেছিলাম। প্রথম অতটা ভেবে দেখিনি। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তোমার মধ্যে বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব নেই। তা যদি থাকত, তাহলে কাল রাতে অমন ভাবে চোরের মতো বিয়ে বাড়িতে পালিয়ে যেতে না। তোমার না হয় লজ্জা-ঘেন্না বলে কিছু নেই, কিন্তু আমার একটা সহ্যের সীমা আছে। তুমি যদি মেয়েলীপনা বন্ধ না করো, পুরুষের মতো যদি বুক ফুলিয়ে চলতে না পারো—তাহলে আমাকেই এখান থেকে চলে যেতে হবে—হয়তো চিরদিনের জন্যেই।

চারু আবার কমলার মুখের দিকে তাকালো। অসহ্য ঘৃণা ফুটে রয়েছে আছে সেখানে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা নেই—টো কালো পরকলা পরানো তাদের ওপর।

চাবুক-খাওয়া কুকুরের মতো পথে বেরিয়ে পড়ল চারু। মনের কোনো অবলম্বন নেই কোথাও—একটা শূন্য আকাশের ভেতর

দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে সে যেন আছড়ে পড়ছে মাটির দিকে। এতদিন যা-কিছু নিয়ে তার দিন কাটছিল, মুহূর্তের মধ্যে কে যেন তার সব কিছু লুঠ করে নিয়ে গেছে—নিঃশেষে দেউলে করে দিয়ে গেছে চারুকে।

এখন ?

কী নিয়ে এখন সে থাকবে ? দশ-বারো বছর বয়স থেকে দিনের পর দিন চারু ফিমেল-পার্টে নিজেকে তৈরি করেছে অক্লান্ত ধৈর্যে—অকুণ্ঠ চেষ্টায়। একদিন যেটা তার প্রসাধন ছিল, আজ সেটা তার দেহ-মনের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। শামুকের খোলার মতো ওটা আজ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে নিজেকে রক্ষা করবার গর্বটাকেই যেন সে হারিয়ে ফেলবে। ড্রামাটিক ক্লাবের মহলায় সে থাকবে না—রিহার্সালের ফাঁকে ফাঁকে যখন গরম চা আর মুরগীর কাট্‌লেট্ আসবে, তখন তাতে কোনো ভাগ থাকবে না চারুর। তার মুখ চেয়ে বাছাই করা হবে না নতুন নাটক। প্রথম অভিনয়ের রাত যখন ঘনিয়ে আসবে, শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে গাছে গাছে যখন টাউন ড্রামাটিক ক্লাবের লাল কালিতে লেখা পোস্টার পড়বে, তখন তাতে কোথাও লেখা থাকবে না : নাম ভূমিকায় চারু বিশ্বাস ! তার পর—তার পর সেই রোমাঞ্চকর সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসবে, থিয়েটার-হলের পাশের পানের দোকানগুলোয় অন্য দিনের চাইতে জোরালো আলো জ্বলবে—ভিড়-জমানো রেস্তোরাঁ থেকে ভেসে আসবে চপ ভাজবার গন্ধ, লোকের ভিড় শুরু হবে কাউন্টারে, তখনো মেক্-আপ রুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভুরুতে পেন্‌সিল টানবে না চারু—ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মিলিয়ে নেবে না লিপ্‌স্টিকের রঙ। ওদিকে হলের

ভেতরে ভরে-আসা আসনগুলো থেকে লোকের কল-কাকলি উঠতে থাকবে, পড়ে-থাকা ড্রপের পেছনে বাজতে থাকবে অর্কেস্ট্রা, আর তার সুরে যুদ্ধের ঘোড়ার মতো প্রতীক্ষায় ছম ছম করবে রক্ত—তখনো চারু কোথাও নেই!

তার পরে ড্রপ সরে গেলে ফোকাসের আলোয় যখন দর্শকের চোখের সামনে দেখা দেবে অপূর্ব অবিশ্বাস্য ইন্দ্রলোক, তখন যে স্বপ্নচারিণী নায়িকার আশ্চর্য অভিনয়ে ঘন ঘন হাততালি পড়তে থাকবে সে আর যেই হোক—চারু বিশ্বাস নয়।

চারুর নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। এই সব দুর্ঘটনা ঘটবার আগে, এই ভয়াবহ পরাজয় স্বীকার করে নেওয়ার আগে সে পাগল হয়ে যাবে! অসম্ভব!

—চারুদা' ?

চারু থেমে দাঁড়াল—একটা আচ্ছন্নতার ঘোর কেটে গেল হঠাৎ। পাশের বাড়ি থেকে একটি মেয়ে ওকে ডাকছে। বাড়িটা চেনা—ক্লাবের একজন উৎসাহী পাণ্ডা গোপাল ডাক্তারের। ওই মেয়েটি গোপালের ছোট বোন—নাম টেঁপী। অসময়ে চায়ের ফরমাশ দিতে হলে গোপাল ওকে টেঁপু বলেও ডাকে।

—কি রে ?

—একটা দরকার আছে। এসো না একবার।

মনের ভেতর একরাশ জমাট মেঘ সত্ত্বেও চারু কৌতুক বোধ করল। ব্যাপারটা জানা। তাদেরই ব্যাঙ্কের মনীশ বলে একটি ছেলের সঙ্গে টেঁপীর পূর্বরাগ চলছে। বিয়ের কথা ওঠবার পরেই মনীশ এ-বাড়ি আসা বন্ধ করেছে, এর-ওর হাতে চিঠিপত্র চলে

এখন। মধ্যে মধ্যেই চারুকেই দূতের কাজটা করতে হয়—দুজনেই ওকে বিশ্বাস করে।

অতএব খানিকক্ষণ গিয়ে বসতে হ'ল গোপাল ডাক্তারের বসবার ঘরে। চা খেতে হ'ল, গল্প করতে হ'ল গোপালের জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে, শেয়ারের বাজার নিয়ে গবেষণা করতে হ'ল আধ ঘণ্টা। তারই মধ্যে এক ফাঁকে টেঁপী হাতে একখানা নীল খাম গুঁজে দিয়ে গেল। কোনো ঠিকানা নেই খামের ওপর, তার দরকারও ছিল না।

কিন্তু এই আধ ঘণ্টার ভেতরেই নিজের ক্লান্ত মনটাকে যেন অনেকখানি সজীব করে তুলতে পারল চারু। এই পীড়িত বিপর্যস্ত অবস্থায় এটুকু তার দরকার ছিল। অস্থিরতাটা এখনো দাপাদাপি করছে মাথার ভেতরে। তবু তাড়াতাড়ি কিছু নেই—ভেবে চিনতে ঠিক করতে হবে কমলার ব্যাপারটা। একবার সদাশিবদা'র সঙ্গেও এ নিয়ে কথা বলা দরকার।

দুপুরবেলা আর একটা কথাও বলল না কমলা। নিঃশব্দে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে চারু একখানা বাংলা উপন্যাস নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে, কমলা মেঝেতে মাদুর পেতে সেলাইয়ের কল নিয়ে বসল। ওই কলটার একটানা শব্দ শুনতে শুনতে বার বার বই থেকে মন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল চারুর, এলোমেলো ভাবে অনেকগুলো কথা সে ভাববার চেষ্টা করতে লাগল। তার পর সমস্ত ভাবনা একরাশ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতরে মিলিয়ে গেল, গত রাতের অসম্পূর্ণ ঘুম চোখের পাতায় ঘন হয়ে চেপে বসতে চাইল। কিছুক্ষণ ধরে একটা অর্থহীন ছায়ামূর্তির মতো মনে হতে লাগল কমলাকে—এক দল ভোমরার গুঞ্জনের মতো মনে হতে লাগল সেলাইয়ের কলের আওয়াজ, তার পর—

তারপর কমলাই তাকে জাগাল।

ধড়ফড় করে উঠে বসল চারু। বাইরে বিকেল নেমেছে। খোলা জানলা দিয়ে এক মুঠো লাল আলো যেন কেউ ছুঁড়ে দিয়েছে কমলার মুখের ওপর। সে আলোয় কমলার মুখ জ্বলছে, চুল জ্বলছে, চোখ জ্বলছে—দুটো আলোর মতো জ্বলছে চশমার কাচ। আশ্চর্য রক্তিম আর অদ্ভুত জ্বলন্ত দেখাচ্ছে কমলাকে।

কমলার হাতে সেই শিরোনামাহীন নীল খামটা। কখন জামার পকেট থেকে বের করে নিয়েছে সেই-ই জানে।

—ওটা যে—

সাপের মত তর্জন করে উঠলো কমলা: থাক্।

—ওটা, ওটা আমার নয়—বিহ্বলভাবে চারু ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে চাইল।

কমলার রক্তিম চোখ-মুখ টকটক করতে লাগল: নিশ্চয়ই নয়। তাহলে তোমার বুক-পকেটে অমনভাবে বুকের কাছে ধরা থাকবে কেন?

চারু আবার একটা কিছু বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই শুরু করেছে কমলা। একটা হিংসা-জর্জরিত তীক্ষ্ণ হাসিতে ভরে গেছে কমলার মুখ: তাই ভাবি, অমনভাবে মেয়েমহলে ঘোরা-ফেরা কেন? বৃহন্নলা সেজে থাকতে জানলেই অন্তঃপুরের দ্বার খোলা পাওয়া যায়। যাক্—তোমার ওপরে এবারে আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে।

—শ্রদ্ধা!—একটা অত্যন্ত আশ্চর্য অপ্রত্যাশিত শব্দ চারুর কানে এসে লাগল। চারু আর একবার ভাল করে দেখতে চাইল কমলার মুখ। থিয়েটারের লাল ফোকাশের মতো জানলা দিয়ে ওই যে রোদের ধারাটা এসে কমলার মুখে পড়েছিল, চক্রের

পলকে সেটাকে সরিয়ে নিলে কে? সমস্ত ঘরময় এখন ছাই রঙের পাণ্ডুর ছায়া। আর সেই ছায়ায় কমলাও বিচিত্রভাবে ছাইবর্ণ হয়ে গেছে, যেন এতক্ষণ ধরে জ্বলতে জ্বলতে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে এইবার। তার দৃষ্টিতে আর ঘৃণা নেই—গম্ভীর কঠিন মুখে আর শাসনের পুঞ্জ মেঘ নেই। শুধুই ভয়—একরাশ ভয় স্তব্ধ হয়ে রয়েছে সেখানে।

যেমন নখ-দর্পণের কাজলে মানুষ নাকি প্রেতাত্মাকে দেখতে পায়, তেমনি কমলার মুখের ওই কালো ভয়ের কজ্জলিত দর্পণে নিজের আর একটা রূপ দেখতে পেল চারু। হঠাৎ তার সোজা হয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করল—ইচ্ছে করল নাটকের জল্লাদের মতো সকলের ওপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। পিঠের মেরুদণ্ডটা তার শির্‌-শির্‌ করতে লাগল—যেন লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠছে সেটা।—একটা ঊর্ধ্বমুখী আকর্ষণে তর্‌-তর্‌ করে উঠে যেতে চাইছে ওপরে।

ওই চিঠিটা যে তার নয়—'মণি আমার' যে সম্পূর্ণ অন্য লোক, তিন দিন যাকে না দেখে 'মনু'র চোখে ঘুম আসছে না সে যে আর একজন, এ-কথা ব্যাখ্যা করবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করল না চারু। এমন কি, কমলা যখন সেটাকে হিংস্রভাবে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে লাগল, তখনও নয়!

কমলার কালো মুখে তখনও সেই নখ-দর্পণের মায়া-কাজল যে-কাজলে মানুষ শুধু প্রেতাত্মাকেই দেখে না, নিজের আত্মাকেও কখনো কখনো দেখতে পায়!

চারু আরো একবার রাস্তায় নামল।

শেষ বোমাটা ফাটল সন্ধ্যাবেলায়—ক্লাব-ঘরে। স্থির নিশ্চিন্ত গতিতে, ডান পা আগে ফেলে চারু ভেতরে ঢুকল। তার পর

বিনা ভূমিকায় বললে, আমি আর ফিমেল-পার্টে অভিনয় করব না শিবুদা'।

—হঠাৎ আবার কী হ'ল—পর্যন্ত বলেই থমকে গেলেন সদাশিব ঘোষ। 'মানিনী' কথাটা আর বেরুল না মুখ দিয়ে—চারুর চোখে কী যে দেখলেন তিনিই জানেন।

তেমনি সংক্ষেপে চারু বললে, আর আমি ফিমেল-পার্ট করব না—আপনারা এবার ললিতকেই পিয়ারার পার্টটা দেবেন।

সদাশিব এবারে প্রতিবাদ করলেন না আর। প্রতিবাদের ভাষাই খুঁজে পেলেন না তিনি।

প্রপাত

সময় সেই সন্ধ্যা ছটায়, তবু ল' কলেজের ক্লাসে দেড়টার পরে আর থাকতে পারল না চিন্ময়। মনে হচ্ছিল দপ্ দপ্ করছে রগের দুপাশ, হাতের নাড়ীতে মৃদু জ্বরের দ্রুতলয় উত্তেজনা। বসে ছিল ঠিক একটা পাখার নীচেই, তা সত্ত্বেও পাঞ্জাবির কাঁধটা ভিজে উঠছিল ঘামে। শেষ পর্যন্ত একেবারে প্রোফেসরের চোখের সামনে দিয়েই বেরিয়ে এল সে।

উতরোল হাওয়া বইছে বাইরে ইউনিভার্সিটির লনে। মাথার একগুচ্ছ চুল হঠাৎ উড়ে পড়ল চশমার উপর—কতগুলো বিসর্পিল কালো কালো রেখায় একবারের জন্যে অস্বচ্ছ হয়ে গেল দৃষ্টি। কোনো দূর অরণ্যের ধ্বনির মত মাথার উপরে শোনা গেল পত্রমর্মর। আশুতোষ মিউজিয়মের গায়ে দাঁড় করানো বাসুদেব-মূর্তিটা একবার নড়ে উঠল যেন।

চোখের সামনে থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল চিন্ময়। মাথার উপরে পাতার শব্দে বুকপকেট থেকে খামখানাও যেন সাড়া দিয়ে উঠেছে। অথবা ভীরু একটা চাপা কণ্ঠস্বরের মত শোনা যাচ্ছে সেই লাইন ক'টা, যা বার বার পড়ে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে চিন্ময়ের।

'আজ সন্ধ্যে ছ'টায়' চাঁদপাল ঘাটের ট্রাম-স্টপটার সামনে দয়া করে একটু দাঁড়াবেন। আমি আসব। দরকারী কথা আছে। ছায়া।'

মনে মনে লাইন ক'টা গুঞ্জন করতে করতে চিন্ময় হাঁটতে লাগল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। একটা পঁয়ত্রিশ।

আরও প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা। কী করে কাটবে এতক্ষণ—কী করে এতখানি অসহ্য সময় পার হওয়া যাবে।

আপাতত মেস। অনেকক্ষণ চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকা। আর চুপ করে ভাবা, হঠাৎ ছায়া এ-চিঠি তাকে লিখতে গেল কেন?

সত্যি, কেন ছায়া এই চিঠি লিখল তাকে।

দুপুরের নির্জন নিঃশব্দ মেসে, তিনতলার সিংগল-সীটেড ঘরে, বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে চিন্ময় সেই কথাটাই ভাবতে চেষ্টা করল। এমন কী তার বলবার আছে যার জন্যে চিন্ময়কে সে ডেকে পাঠিয়েছে সন্ধ্যা ছটার সময়—চাঁদপাল ঘাটের ট্রাম-স্টপের সামনে?

সকালে চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই একটা তীক্ষ্ণ অস্বস্তিতে জর্জরিত হচ্ছে চিন্ময়। কী চায় ছায়া? মুক্তি? বলতে চায়, আমার জীবনে আর একজন মানুষ অনেকদিন থেকে অপেক্ষা করে আছে, তাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না! বলবে, বাংলা দেশে অনেক সু-পাত্রী জুটবে আপনার জন্যে, শুধু আমায় আপনি দয়া করুন।

অথবা—

অথবা আর কী হতে পারে? চারদিন আগে, মাত্র পনেরো মিনিটের জন্যে যার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, যার ছায়া-ছড়ানো করুণ মুখের আবছা আভাস মাত্র মনে করতে পারে চিন্ময়, যার হাতের আংটির পোখরাজ পাথরটা মাত্র বারকয়েকের জন্যে জ্বলজ্বল করে উঠেছিল আসন্ন সন্ধ্যার শান্ত আলোতে, সেই ছায়াসঙ্গিনীর মত মেয়েটি কেন হঠাৎ এই প্রগলভ চিঠির আশ্রয় নিয়েছে?

চারদিন আগে রবিবারের ছুটি ছিল। সকালবেলা নিশ্চিন্ত

মনে খবরের কাগজটা পড়বার সময়েও একবার এসে হানা দিয়েছিল বলাইদা।

—এই, ভালো চা আর গরম জিলিপি আনা এক ঠোঙা।

—তা আনাচ্ছি। কিন্তু তুমি হঠাৎ পাড়ার রোয়াকের মায়া ছেড়ে এখানে এসে জুটলে যে?

—কী করব? চিন্ময়ের সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে বলাইদা বললে, কাল রাত্রেও রমাপ্রসাদবাবু এসেছিলেন। বললেন, তুমি আর একবার ওকে মনে করিয়ে দিয়ো বলাই। এ-কালের ছেলে, কখন্ আবার ভুলে যায়—

চিন্ময় হাসল: একালের ছেলেদের স্মৃতিশক্তির বালাই নেই, এ-ধারণা কী করে জন্মাল রমাপ্রসাদবাবুর? কিন্তু সত্যি বলাইদা, আমার কেমন উৎসাহ হচ্ছে না।

বলাইদা ভুরু কোঁচকাল—পাকামো হচ্ছে নাকি? আজ তিন মাস ধরে সারা কলকাতায় তোমার জন্যে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছি, আর এখন বলা হচ্ছে উৎসাহ পাচ্ছি না।

—বিয়ে করতে আপত্তি নেই, কিন্তু মেয়ে দেখাটাই—

একটানে সিগারেটের আধখানা শেষ করলে বলাইদা— বুঝেছি, আর বলতে হবে না। অর্থাৎ, এ-যুগে এ-রকম বর্বরতা আর সহ্য হয় না, একটি মেয়েকে গোরু-ছাগলের মত—ইত্যাদি ইত্যাদি। ওসব লেকচার ছেড়ে দে। না দেখে একটা কালো-কোলো হাবাগোবা মেয়ে বিয়ে করার ইচ্ছে থাকলে সেটা আগে বললেই হ'ত। পাঁচ মিনিটে কনে জুটিয়ে দিতুম, এসব ঝকমারি আমাকে পোয়াতে হ'ত না।

চিন্ময় বললে, না-না, জীবে দয়া করবার ঔদার্য আমার নেই।

শিক্ষিতা সুন্দরী স্ত্রী সবাই চায়—আমিও চাই। শুধু বলছিলুম এভাবে মেয়ে দেখতে যাওয়াটা—

বলাইদা বললে, তুই একটা ছাগল। এত টুইশন করলি, ডজন খানেক স্কুল-কলেজের মেয়ে পড়ালি, তার মধ্যে থেকে একটা প্রেম-ট্রেমের ব্যবস্থা করে নিতে পারলিনে? তাহলে তো এসব ঝামেলা করতে হ'ত না। নে, এখন চটপট চা আর জিলিপি আনতে দে। আর মনে রাখিস, ঠিক চারটের সময় আমি আসব, তুই জামা-কাপড় পরে রেডি হয়ে থাকবি।

অতএব যেতেই হ'ল চক্রবেড়েতে। ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক সাড়ে চারটেয়।

হলদে রঙের পুরনো দোতলা বাড়ি। সামনে হাত পাঁচ-ছয় খানিকটা চতুষ্কোণ জমি, একটা জীর্ণ চেহারার ইউক্যালিপটাস এক গুচ্ছ শীর্ণ পাতার অঞ্জলি তুলে বেমানানভাবে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। বাড়িটাকে আচমকা কেমন শ্রান্ত, কেমন অবসন্ন মনে হয়।

রমাপ্রসাদবাবু দাঁড়িয়েই ছিলেন। অভ্যর্থনা করে নিয়ে বসালেন বাইরের ঘরে। পুরনো ফার্নিচার, পুরনো ফোটো, বিলিতী তেল-কোম্পানির রংচঙে ক্যালেণ্ডার, তক্তপোশের উপরে পাতা সুজনিটায় ইস্ত্রির মরচে ধরা দাগ একটা। শুধু কোনাভাঙা দুটো কাচের ফুলদানি থাকলেই যেন সম্পূর্ণ হ'ত সবটা।

তারপর সব সেইরকম। সেই দরজার পর্দার ওপার থেকে কয়েকটি পা আর শাড়ির প্রান্ত, চুড়ির আওয়াজ আর চাপা ফিসফিসানি, একটি আট-ন বছরের মেয়ের পর্দা সরিয়ে একবারের জন্যে মুখটি বাড়িয়ে দেওয়া, আর রমাপ্রসাদবাবুর একটানা বলে যাওয়া: মেয়েটি আমার দেখতে শুনতে ভালোই, রান্না-সেলাই সবই

জানে, তবে লেখাপড়া বেশীদূর করেনি—ম্যাট্রিকের আগে টাইফয়েড হয়েছিল—

সব সেইরকম। সেই সিঙাড়া-লেডিকেনি-সন্দেশের খাবারে প্লেট। মেয়ে দেখতে এলে কী কী খাবার সাজিয়ে দিতে হ মিঠাইওয়ালাদের পর্যন্ত মুখস্থ আছে সেটা। সেইসঙ্গে সবি অনুরোধ: না, না—ও আর ফেলে রাখবেন না, দুটি তো মি সামান্য ব্যবস্থা—

পুরনো ফোটো, পুরনো ফার্নিচার, পুরনো ঘড়ির শব্দ, অ পুরনো সামাজিকতার ভিতরে চিন্ময় যখন ক্রমশই স্তিমিত হ উঠছিল, তখন দু-হাতে দু-পেয়ালা চা নিয়ে ছায়া ঘরে ঢুকল।

এ-পর্যন্ত সব জ্যামিতির নিয়মে চলছিল, কিন্তু ইউক্লিডে থিয়োরেম এইবারে হোঁচট খেল একটা। এই ঘরে, এমনি পুরে নীতি-নিয়মের ভিতরে মেয়েটি এমন আকস্মিকভাবে দেখা দি যে, চমকে উঠল চিন্ময়। যেন বটতলার রামায়ণের ভিতর থেকে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল অবনীন্দ্রনাথের একখানা ছবি।

কী ছিল মেয়েটির চেহারায়? চিন্ময় আজও সে-কথা জানে না ভোরের তারার মত আলো-অন্ধকারে জড়ানো চোখ, হালকা মে ছাওয়া জ্যোৎস্নার মত শরীর, ঠোঁটের কোণে নিঃশব্দ কান্নার ম কী একটা মাখানো।

একবার রমাপ্রসাদবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখল চিন্ময়। বাহুল্য হীন বেঁটে খাটো চেহারা, মোটা মোটা হাতের আঙুল, পল বসানো রুপোর আংটি একটা, মোটা নাকের তলায় সযত্নে কাঁ ছাঁটা গোঁফ। এঁরই মেয়ে। ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

বলাইদা কী দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করল, ভালো করে শুনতে

পেল না চিন্ময়। মাত্র কয়েক পলক দেখার জন্যে মনকে বাড়িয়ে নিয়ে বসে রইল স্বপ্ন-বিহ্বলের মত।

দশ-পনেরো-বিশ মিনিট। বলাইদার বেসুরো গলায় ঘোর কেটে গেল—আজ আমরা তবে উঠি।

আচ্ছন্নের মত বেরিয়ে এল চিন্ময়। শুধু একবারের জন্যে মাথা তুলে দেখল ইউক্যালিপটস গাছটাকে। পড়ন্ত দিনের ছাইরঙ লালচে আকাশের দিকে একগুচ্ছ শীর্ণ পাতার অঞ্জলি। খেয়ালের মত তার মনে হ'ল, ওই গাছটার কী যেন একটা মনে আছে। কিছু বোঝা যাচ্ছে, কিছুটা বোঝা যাচ্ছে না।

ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে বলাইদা বললে, কেমন দেখলি?

—ভাল লাগল। আমি রাজী আছি।

—হুঁ!—বলাইদা একবার তাকাল চিন্ময়ের চোখের দিকে, সেই পুরনো নিয়মেই হয়তো কোনো একটা রসিকতা করতে চাইল, কিন্তু তার পরেই আর কথা খুঁজে পেল না। বলাইদাও কি ওই ইউক্যালিপটাস গাছটাকে দেখতে পেয়েছে? সেও কি একটা মানে বুঝতে চাইছে মনে মনে?

সেই ছায়া তাকে চিঠি লিখেছে। সেই মেয়েটি।

সেদিন ছায়ার মতই পা জড়িয়ে জড়িয়ে ঢুকেছিল ঘরে। থেমে-যাওয়া সেতারের ঝঙ্কারের মত কী একটা বয়ে এনেছিল নিজের সঙ্গে। সেই ছায়া কী কথা তাকে বলতে চায়? ফিকে নীল একটুকরো কাগজে মাত্র তিনটি সংক্ষিপ্ত লাইনে কোন্ আশ্চর্য সংবাদের সংকেত লুকিয়ে রেখেছে?

চিন্ময় উঠে বসল। সাড়ে তিনটে। বাইরে ক্ষুরের-ফলা রোদ

এখনও। রাস্তায় হাঁপিয়ে চলা ট্রাম-বাসের ম্যারাথন রেস। ফুটপাথ ঘেঁষে পড়ে থাকা পিচ-জ্বালানো কদাকার গাড়িটা থেকে উগ্র বিস্বাদ গন্ধ। ওপাশের বাড়িটার তেতলার কার্নিশে একটা দুঃসাহসী সাদা-কালো বেড়ালের থাবা চেটে চেটে প্রসাধনের চেষ্টা।

চিন্ময় থাকতে পারল না। জামা চড়িয়ে, চটিটা পায়ে টেনে আবার নেমে এল রাস্তায়। উঠে পড়ল চৌরঙ্গির ট্রামে। আর একবার ইচ্ছে হ'ল, পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে পড়ে নেয়। কিন্তু দরকার ছিল না, নির্ভুলভাবে লেখাটা মুখস্থ হয়ে গেছে।

চৌরঙ্গির একটা চায়ের দোকানে খানিকটা সময় কাটল। আরো খানিক সময় কাটল বইয়ের স্টলে এলোমেলো পাতা উল্টে। তারপর ডালহৌসি স্কোয়ার হয়ে পায়ে হেঁটে চাঁদপাল ঘাটের কাছে যখন পৌঁছুল, তখন সাড়ে পাঁচটার কাছাকাছি।

আরো—আরো আধঘণ্টা।

রেল লাইনের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেখল নোঙর-ফেলা নিথর জাহাজগুলোকে। দেখল গঙ্গার স্রোতে ভেসে ভেসে গাংশালিকের খেলা আর ফেরি-লঞ্চের আনাগোনা। তারপর হাতের ঘড়িতে যখন ছটা বাজতে দশ মিনিট, সেই তখন এসে দাঁড়াল ট্রাম-স্টপের সামনে। এতক্ষণে মাথার দু'ধারের রগ দুটো আবার দপ দপ করতে শুরু হয়েছে, হাতের নাড়ীতে আবার উত্তেজিত জ্বরের স্পন্দন।

ছায়া এল ছ'টার তিন মিনিট আগেই।

চিন্ময় ভেবেছিল, হয়তো চিনতে পারবে না। হয়তো আভাসের মত যাকে দেখেছে, এই মুহূর্তে তাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে মনে

হবে। আর ছায়াই কি দেখেছে তাকে? তার দিকে চোখ তুলেই কি তাকিয়েছে একটি বারের জন্যেও?

তবু দু-জনেই দু-জনকে চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গেই।

সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই, জড়তা নেই। আশ্চর্য স্বাভাবিক গলায় ছায়া বল্লে, অনেকক্ষণ এসেছেন?

হার স্বীকার করল না চিন্ময়। মিথ্যে কথাই বললে।

—মিনিট পাঁচেক।

—কোনো কাজের ক্ষতি হয় নি আপনার?

—না, কিছু না।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ছায়া। সেই পুরনো ঘরটার মতই আলো-অন্ধকার এখানে। আরো নিবিড়—আরো সংকেতিত। খানিকটা চেনা যায়, অনেকটা চেনা যায় না।

উত্তেজনায় টান টান স্নায়ু। প্রত্যেকটা মুহূর্ত খরমুখ। চিন্ময় সইতে পারল না।

—কেন ডেকেছিলেন আমাকে?

ছায়া মুখ তুলল। আধবোজা চোখ মেলে ভাল করে তাকাল কিনা বোঝা গেল না।

—চলুন, বসি কোথাও।

—ইডেন গার্ডেনে?

—ঘাটের জেটিতেই চলুন।

চিন্ময় বুঝল। একেবারে একান্ত হতে চায় না। ইডেন-গার্ডেনের ঘন ঘাসের নির্জনতায় নয়, এক-আধজন কাছাকাছি থাকুক, নিভৃতির ভিতরেও থাকুক লৌকিক সৌজন্য!

—তাই চলুন তবে।

বেঞ্চিগুলোতে জায়গা ছিল না। জেটির বাঁ-দিকে নীচু পণ্টুনের উপর যেখানে জোড়া-অজগরের মত দুটো জলের পাইপ এসে নেমেছে, পায়ে পায়ে দু'জনে এগিয়ে গেল সেখানেই।

—এখানে কোথায় বসবেন? চিন্ময় প্রশ্ন করল।

—কাঠের উপরেই বসা যাক। খানিক দূরে নোঙর ফেলা দুটো জাহাজের ভূতুড়ে গম্ভীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে ছায়া বললে, আপনার অসুবিধে হবে না?

—না।

দু'জনে বসল। এপারে আলো, ওপারে আলো, মাঝখানে কালো গঙ্গা। ডানদিকে অনেক দূরে হাওড়া-ব্রিজের বৈদ্যুতিক সরল রেখা। যেন একটা তারার বল্লম দিয়ে এপার-ওপার গেঁথে রেখেছে কেউ।

ছায়াই শুরু করল এবং বিনা ভূমিকাতেই।

—ক্ষমা করবেন। আমার নাম ছায়া নয়।

চিন্ময় চমকে উঠল। যেন কথাটা শুনতেই পায়নি।

—কী বলছেন?

—আমার নাম ছায়া নয়। বন্দনা।

নির্বোধের মত কিছুক্ষণ চেয়ে রইল চিন্ময়। বললে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বন্দনা আস্তে আস্তে বললে, বোঝাটা কিছু শক্ত নয়। আপনি ছায়াকে দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ছায়া কালো, ছায়া কুৎসিত। তার কপালে একটা ধবলের দাগ। তাই ছায়ার ভূমিকায় আমাকেই অভিনয় করতে হয়েছে।

গঙ্গার কালো জলে একটা স্টিমারের কর্কশ বাঁশি বাজল,

কয়েকটা লাল-নীল আলো ভেসে চলল কাঁপতে কাঁপতে। চিন্ময়ের মনে হ'ল, পণ্টুনটাও কাঁপছে তার সঙ্গে সঙ্গে, দুলছে ওপারের আলোগুলো, হাওড়া ব্রিজের তারার বলয়টা থেকে থেকে বেঁকে যাচ্ছে ধনুকের মত।

একটা অস্ফুট শব্দ করল চিন্ময়।

—গল্পের মত মনে হচ্ছে, তাই না? বন্দনার গলাটা যেন গঙ্গার ওপার থেকে শুনতে পেল চিন্ময়, আমাকে দেখিয়ে ওঁরা ছায়ার সঙ্গে আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করছিলেন।

চিন্ময় নড়ে উঠল।

—আপনি ঠাট্টা করছেন তো?

—ঠাট্টা করবার মত পরিচয় কি আপনার সঙ্গে আছে আমার? শীতল নিষ্প্রাণ স্বরে বন্দনা জবাব দিলে।

সত্যিই, সে-পরিচয় নয় বন্দনার সঙ্গে। মাত্র পনেরো মিনিটের জন্যে দেখেছিল। তাও কয়েকবার চোরের মত তাকিয়েছিল সভয়ে। না, বন্দনা ঠাট্টা করছে না।

গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়াতেও চিন্ময় ঘামতে লাগল।

—কিন্তু বিয়ের সময়ই তো ধরা পড়বে সব। তখন যদি—

—উঠে আসেন বাসর থেকে? চিন্ময়ের কথাটা বন্দনাই কুড়িয়ে নিলে, পাড়ার ছেলেদের আপনি চেনেননি চিন্ময়বাবু। আপনি কি আশা করেন যে, কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোককে বিপদে ফেলে আপনি পালিয়ে আসবেন, আর তারা আদর করে একখানা ট্যাক্সি ডেকে দেবে আপনাকে?

দাঁতে দাঁত চেপে খানিক নিথর হয়ে রইল চিন্ময়। হঠাৎ নিজের ডান হাতে একটা বন্য বর্বর শক্তি যেন অনুভব করল সে।

ম্লান আলোয় এক ফোঁটা শিশিরের মত পোখরাজের আংটিটা জ্বলছে বন্দনার আঙুলে, ইচ্ছে করলে ওই আঙুলটা সুদ্ধ বন্দনার ছোট মুঠোটাকে এক্ষুনি সে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে পারে।

হিংস্র কিছু না করে কেবল কপালের ঘামই মুছে ফেলল চিন্ময়। শুকনোভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু আপনি কেন একাজ করতে গেলেন? আপনি কি ওঁদের আত্মীয়া?

প্রশ্নটার জন্যে বন্দনা অপেক্ষা করছিল। আবার ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল। চোখ দুটো দেখা গেল না, তারা অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

—সে-কথা থাক। না-ই বা শুনলেন।

—অভিনয় করেছিলেন, ভালোই করেছিলেন। চিন্ময় বিষাদ-হাসি হাসল, 'কিন্তু এ-কথাগুলো কেন বলতে এলেন আমাকে? এটুকু অনুগ্রহ করার কী দরকার ছিল?

আকস্মিকভাবে উঠে দাঁড়াল বন্দনা।

—আজ আমি যাই চিন্ময়বাবু।

আবার সর্বাঙ্গে সেই ক্রুদ্ধ হিংস্রতার বিদ্যুৎ বয়ে গেল চিন্ময়ের। দাঁড়িয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই।

—জবাব দিলেন না?

—কী হবে জবাব দিয়ে? আপনি বুঝবেন না। যাবার জন্যে পা বাড়াল বন্দনা।

চিন্ময়ের অবাধ্য হাতটা এবারে আর শাসন মানলা না। নগ্ন নির্লজ্জ ক্রোধে বন্দনার মুঠোটা চেপে ধরল মুহূর্তের মধ্যে। থর থর করে বন্দনা কেঁপে উঠল একবার, তারপরেই পাথর হয়ে গেল।

—কী করছেন আপনি? পাগল হয়ে গেলেন?

হাত ছেড়ে দিলে চিন্ময়, কিন্তু তার চোখ দুটো বুনো জন্তুর মতো জ্বলছে তখনো।

—চুলোয় যাক ছায়া—অধঃপাতে যাক। আপনি আমায় বিয়ে করতে পারেন ?

এর জন্যেও কি প্রতীক্ষা করছিল বন্দনা ? সে-ই জানে। অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক স্বরে বললে, আমি কে, আমার কী পরিচয়—আপনি জানেন ?

—জানবার দরকার নেই। বিয়ে করবেন আমাকে ?

কোথা থেকে চলন্ত স্টিমারের একটা দীর্ঘ রশ্মি এসে ছড়িয়ে পড়ল বন্দনার মুখে। সেই ভোরের তারার মত ম্লান আচ্ছন্ন তার চোখ, ঠোঁটের কোণে সেই বিষণ্ণতার মায়া মাখানো।

বন্দনা আস্তে আস্তে বললে, না।

হাওড়ার ব্রিজ একটা তারার বল্লমের মত গঙ্গার এপার-ওপারকে গেঁথে রেখেছে। জাহাজ-দুটো দাঁড়িয়ে আছে অবাস্তব ফ্যান্টাসির মত। দু-দিকের এত আলোর ভিতরে গঙ্গার জলটা কী অবিশ্বাস্য রকমের কালো !

চিন্ময় বললে, আচ্ছা আপনি যান। যে-উপকারটুকু করলেন, অনেক ধন্যবাদ সেজন্যে।

তবু যাওয়ার আগে বন্দনা আরো কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে রইল। কী একটা বলতে গিয়ে বারকয়েক কাঁপতে লাগল তার ঠোঁট।

—আশা করি, রমাপ্রসাদবাবুকে—

—আমি জানি। বন্দনার উপস্থিতি এবার অসহ্য মনে হতে লাগল চিন্ময়ের, আপনাকে বলতে হবে না। আপনি যান—

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বন্দনা। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চিন্ময় এবার ধপ করে হিমশীতল একটা পাইপের উপরেই বসে পড়ল। সারাদিনের উত্তেজনার টানটা ছিঁড়ে গেছে—শরীরে একটা গুরু-ভার অবসাদ নেমে এসেছে। ভূতুড়ে জাহাজ দু'টোর দিকে বিমর্ষ দৃষ্টি ফেলে বসে রইল সে, পাইপের মুখ থেকে ঝির ঝির করে জল নেমে এসে তার জুতোর তলাটা একটু একটু করে ভিজিয়ে দিতে লাগল।

ছ'বছর পরে আবার মেয়ে দেখতে যেতে হ'ল চিন্ময়কে। মুন্-সেফির নমিনেশন পাওয়ার পরে। এবার রাঁচিতে। কিন্তু জাল-জুয়াচুরির কোনো ভয় ছিল না। মেয়ের বাপ বড়দরের সরকারী চাকুরে। হাজারীবাগ রোডে প্রকাণ্ড বাংলো। হাল-আমলের ড্রয়িংরুমে অত্যন্ত নিঃসঙ্কোচভাবেই মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েটি। টি-পট্ থেকে চা ঢেলে দিলে মৃন্ময়ের পেয়ালায়, রাঁচির আবহাওয়া নিয়ে গল্প করল, গান শোনাল অর্গ্যান বাজিয়ে।

এবার বলাইদা নয়, অন্য ছটি বন্ধু ছিল সঙ্গে।

বাইরে বেরিয়ে লঘু ঈর্ষাভরা গলায় ব্যোমকেশ বললে, তুই ভাগ্যবান রে!

চিন্ময় মৃদু হাসল, তাই মনে হচ্ছে আপাতত। তবে শেষ পর্যন্ত পা বাড়াল না হলেই বাঁচা যায়!

চিন্ময় বন্ধুরা ভেঙে পড়ল অট্টহাসিতে, সেই বন্দনা? না-না, এবার নির্লজ্জার সে-ভাবনা নেই।

থর থ... চাঁদপাল ঘাটের সেই সন্ধ্যাটা সহজে ভুলতে পারা যায় নি। একটা সূক্ষ্ম বেদনা থেকে থেকে মনের মধ্যে বেজে উঠত, তার হাত

থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে গল্পটা বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে চিন্ময়। ক্রমেই ব্যাপারটা কৌতুকের রূপ নিলে।

চেনা-জানা কেউ কনে দেখতে গেলেই একজন আর-একজনকে সাবধান করে দেয়: জাল কিনা ভাল করে যাচাই করে নিয়ো হে! সব মেয়েই তো বন্দনা নয় যে আগ-বাড়িয়ে এসে উপকার করে যাবে!

খুশিতে চঞ্চল হয়ে এগিয়ে চলল তিনজন। ফাল্গুন মাসের চমৎকার সকাল। মিষ্টি ঠাণ্ডা—মিষ্টি রোদ—ঝিলমিল পাতা আর পাখীর ডাক।

অমল বললে, কথা তো একরকম দিয়েই এলি দেখছি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্ময় বললে, কী আর করা যায়। মা আলটিমেটাম্ দিয়েছেন। আসছে বোশেখ মাসের মধ্যে বিয়ে না করলে তীর্থযাত্রায় বেরুবেন। সে যাক, আজই ফিরবি নাকি কলকাতায়?

ব্যোমকেশ গালের পাশ থেকে পাইপটা বের করে আনল: এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? থেকে যাই আর একটা দিন। চল্, আজ বেরিয়ে আসি হুড্রু থেকে।

—হুড্রু? বারকয়েক দেখেছি—পুরনো হয়ে গেছে।

ব্যোমকেশ বললে, ইডিয়ট! হুড্রু কখনো পুরনো হয় না। ওর যে কী একটা আশ্চর্য সৌন্দর্য আছে, যখনি দেখি, তখনি মনে হয় এভারনিউ। চল—গাড়ির জোগাড় করি।

খাওয়া-দাওয়ার পর তিনজনে বেরুল ট্যাক্সি নিয়ে।

হুড্রুতে যখন গাড়ি পৌঁছুল তখন মনটা যেন দশ বছর পেছিয়ে গেছে অমলের।

ব্যোমকেশ বললে, হাউ লাভ্‌লি।

অমল বললে, দূর—একা একা এসে ভাল লাগে না এখানে। সঙ্গে ফিয়াঁসী না থাকলে কেমন ফিকে ফিকে লাগে যেন।

ব্যোমকেশ পাইপটা গালের একপাশে ঠেলে দিলে। তারপর চোখের একটা ভঙ্গি করে বলল, দেয়ার ইজ্‌ এ চান্স ফর ইউ। পারো তো পিক্‌-আপ করে নাও না।

চিন্ময় আর অমল তাকিয়ে দেখল। ছোট বড় পাথরের মধ্য দিয়ে টাল্‌ খেতে খেতে সুবর্ণরেখার রূপালী জল যেখানে এসে নীচের শূন্যতায় ঝাঁপ দিয়েছে, ঠিক প্রায় তারই কাছাকাছি নিথর হয়ে বসে আছে একটি মেয়ে। মগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে ওধারের কালো পাহাড় আর কালো জঙ্গলের দিকে।

চিন্ময়ের পা দুটো যেন পাথরের মধ্যে আটকে গেল। তৎক্ষণাৎ আবছা স্বরে চিন্ময় বললে, বন্দনা! বন্দনা! ব্যোমকেশের মুখ থেকে টপ করে পাইপটা নীচে পড়ে গেল। যেন সামনে সাপে ফণা তুলেছে এমনিভাবে লাফিয়ে উঠল অমল।

পাইপটা কুড়িয়ে নিয়ে ব্যোমকেশ বললে, চল্‌—আলাপ করি।

এতক্ষণের খুশিটা দপ করে নিবে গেছে একটা দমকা হাওয়ায়। আবার দপ দপ করছে কপালের রগগুলো। দু'বছর আগেকার চাঁদপাল ঘাটের সন্ধ্যাটা ফিরে এসেছে, ডান হাতে ছটফট করছে সেই বন্য হিংস্র শক্তিটা।

ভুল হয়ে গিয়েছিল, সেদিন অত সহজেই ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল না বন্দনাকে। অনেক নিদ্রাহীন রাত্রে দুঃসহ অন্তর্জ্বালায় সে-কথা ভেবেছে চিন্ময়, মনে হয়েছে একটা নিষ্ঠুর কঠিন কিছু তার করা উচিত ছিল সেদিন। শক্ত মুখে চিন্ময় বললে, না।

—পুরনো আলাপটা ঝালিয়ে নিবি না? অমল হাসল, আবার পাত্রী দেখতে এসেছিস সে-খবরটা দিবিনে ওকে?

—দরকার নেই। চল্ নীচে নামি—

বন্ধুরা কিছু একটা বুঝল, রসিকতা করতে গিয়ে সেদিনের বলাইদার মত থমকে গেল ব্যোমকেশ। নামতে শুরু করল তিনজনে।

কিন্তু হাত কয়েক নেমেই থমকে দাঁড়াল চিন্ময়।

—তোরা ঘুরে আয়। আমি উপরেই রইলাম।

ব্যোমকেশ আর অমল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল একবার। নেমে গেল নিঃশব্দে।

চিন্ময় যখন ফিরে এল, তখনো সেই ভাবেই মগ্ন হয়ে বসে আছে বন্দনা। যেন স্বপ্ন দেখছে। পায়ে পায়ে চিন্ময় এগিয়ে গেল।

—শুনুন।

হুডরুর তীব্র গর্জনের মধ্যেও ডাকটা শুনতে পেল বন্দনা। ফিরে তাকাল চিন্ময়ের দিকে।

—চিনতে পারেন? কঠিন মুখে আবার প্রশ্ন করল চিন্ময়।

—পারি বইকি। বন্দনা শ্রান্ত হাসি হাসল, আপনি ভোলবার নন। কিন্তু এখানে আপনাকে আশা করতে পারিনি।

বিনা নিমন্ত্রণেই পাশের পাথরটার উপরে বসে পড়ল চিন্ময়। বললে, রাঁচিতে মেয়ে দেখতে এসেছিলাম। চমৎকার পাত্রী। তাছাড়া এবার আর ডুপ্লিকেটের ভয় নেই।

—নেই নাকি? বন্দনা তেমনি ক্লান্তভাবে হাসল, যাক, খুশি হলাম।

চিন্ময় আশ্চর্য হল। কথাটার একটা প্রতিক্রিয়া আশা

করেছিল, ভেবেছিল অন্ততঃ একবারের জন্যেও চকিত হয়ে উঠবে বন্দনা, অন্ততঃ অপমানের এক ঝলক রক্তের উচ্ছ্বাস ফুটে উঠবে গালে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। একখণ্ড পাথরের মতই নিরুত্তাপ বন্দনা।

কেমন যেন কুঁকড়ে গেল চিন্ময়, হঠাৎ অত্যন্ত ইতর মনে হ'ল নিজেকে। একটা ঢোঁক গিলে বললে, আপনি এখানে যে?

বন্দনা বললে, দুটি পাতালের সঙ্গী জুটিয়েছি, পালিয়েছি তাদের সঙ্গে। বলছে বম্বেতে নিয়ে গিয়ে ফিল্মে নামাবে, আপাতত দেখছি রাঁচিতে এনে হাজির করেছে। তারপরে কোথায় নিয়ে যাবে জানি না।

মাথার উপর একটা শক্ত পাথর দিয়ে যেন ঘা মারল কেউ। আকস্মিক যন্ত্রণায় বিবর্ণ হয়ে গেল চিন্ময়ঃ পাগল হয়ে গেছেন আপনি? সেদিন যে-কথা বন্দনা জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ ঠিক সেই প্রশ্নই বেরিয়ে এল চিন্ময়ের মুখ দিয়ে।

একটা ছোট নুড়ি তুলে নিয়ে একরাশ ফেনিল জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিলে বন্দনা।

—কী করব বলুন? বাবা কালো, মা কুৎসিত—হঠাৎ কোথেকে জন্ম হ'ল আমার?

বন্দনার মুখটা বিকৃত হয়ে গেল, বাবা কদর্য সন্দেহ করলেন মাকে। সে সন্দেহ আরো বীভৎস হয়ে উঠল যখন পর পর ছায়া আর কমলা জন্মাল বাবার ঠিক মিল দিয়ে। শেষ পর্যন্ত মাকে আত্মহত্যাই করতে হ'ল, আর বাবা তাঁর সমস্ত প্রতিশোধ নিলেন আমার উপর। লেখাপড়া শেখালেন না—যারা দু-একজন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, জঘন্য অশ্লীল চিঠি লিখে ভাংচি দিলেন

তাদের। তারপর থেকে বাবার দুটি খাঁটি কন্যার জন্যে আমাকে সিটিং দিতে হয়েছে। ছায়া-কমলা দু'জনকেই পার করেছেন বাবা। যদিও ছায়ার স্বামী দু'দিন পরেই ছায়াকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে, তবু তো কন্যাদায় উদ্ধার হয়েছে ওঁর।

চিন্ময় স্থবিরের মত বসে রইল। রক্তে যে উত্তাপ জেগেছিল, তার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই আর। এখন মেরুদণ্ড দিয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বইছে, একটা তীক্ষ্ণ আকস্মিক শীতে জমে যেতে চাইছে আঙুলগুলো।

লেখাপড়া শিখিনি, তবু একটা প্রাইমারী স্কুলে অ-আ ক-খ'র চাকরি জুটিয়েছিলাম। বাবার একখানা বেনামী চিঠিতেই সে চাকরি গেল। ফিল্মে নামতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কনে দেখার আড়ষ্ট ভূমিকাটাই অভ্যেস আছে—চলল না। নার্স হতে গেলাম —সেখানেও বাবা কী মন্ত্র পড়লেন, তাড়িয়ে দিলে আমাকে। শুধু অধঃপাতের দরজাই দরাজ ছিল সব সময়ে, কিন্তু মা-র স্বর্গগতঃ মুখ ভুলতে পারিনি তখনো। কিন্তু আর থাকা গেল না। মা বেঁচে থাকতেই বাবা নতুন সংসার করেছিলেন, দ্বিতীয়পক্ষের ট্যারা মেয়ে কেয়া পনেরোয় পা দিয়েছে। আবার আমায় কেয়ার পার্ট শুরু করতে হবে। তাই পাড়ার ছুটো নামকরা ছেলের সঙ্গেই পালাতে হ'ল শেষ পর্যন্ত।

মেরুদণ্ডের মধ্যে ঠাণ্ডা স্রোতটা বরফ হয়ে গেছে চিন্ময়ের। কন্‌কনে শীতে দাঁতগুলো ঝন্‌ঝন্ করে উঠছে। চিন্ময় অস্পষ্ট গলায় বললে, তারা কোথায়?

—নীচে নেমেছে প্রায় তিন ঘণ্টা আগে। সঙ্গে ফ্লাস্ক ছিল। এখন মনে হচ্ছে মদ ছিল তাতে। পায়ে একটা ব্যথার জন্যে আমি

নামতে পারিনি, আপাতত বেঁচে গেছি ওদের হাত থেকে। কিন্তু আজ না হোক কাল আছে, কালের পরে পরশু আছে—ওরা তা জানে।

বন্দনা উঠে দাঁড়াল। চিন্ময় বন্দনার দিকে তাকাল—কিন্তু মুখটা দেখতে পেল না। হঠাৎ যেন ওর মাথাটা মুছে গেছে। সামনে দাঁড়িয়ে একটা মুণ্ডহীন শরীর, একটা বীভৎস কবন্ধ।

আকস্মিক অর্থহীন ভয়ে তীব্র চিৎকার করল চিন্ময়। সেই চিৎকারে বন্দনা চমকে পিছিয়ে গেল, সেখান থেকে পিছলে পড়ল আরো দু' হাত দূরে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আবার টলে পড়তে গেল সেখানে—যেখানে একরাশ ফেনিল জল সোজা নীচের বিপুল শূন্যতায় ঝাঁপ দিয়েছে।

চকিতে দৃষ্টিটা স্বচ্ছ হয়ে গেছে চিন্ময়ের, রক্তের মধ্যে হঠাৎ বরফ-গলানো সূর্য জ্বলে উঠেছে। মুহূর্তের জন্যে শুনল প্রপাতের রাক্ষস-গর্জন, দেখতে পেল বন্দনার চোখে-মুখে মৃত্যুর আসন্নতা।

প্রাণপণ শক্তিতে দু' হাত বাড়িয়ে অনিবার্য রসাতল থেকে বন্দনাকে টেনে আনল চিন্ময়। প্রায়-মূর্ছিত বন্দনাকে বুকের মধ্যে আশ্রয় দিয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলতে ফেলতে বললে, আপনি আমার সঙ্গেই কলকাতায় ফিরে যাবেন। আজকেই।

জান্তব

পাইন আর দেওদারের ছায়াকুঞ্জের নীচে পাহাড়ীদের গ্রাম।

নগাধিরাজের কোলে কোলে বিচ্ছিন্ন উপত্যকা। চারিদিকের দুর্গমতার মাঝখানে যেন প্রকৃতির সযত্ন লালিত এক-একটি আশ্রয়। পাথরের সিঁড়ি কেটে যে মানুষগুলো ওঠা-নামা করে, ঝোরা থেকে কলসী ভরে আনে, তাদের মুখ থেকে শুরু করে শরীরের সমস্ত পেশীগুলো পর্যন্ত যেন পাথরে তৈরী। পাহাড় ধ্বসে, শাল-পাইন দেওদারের বনকে উত্তাল উতরোল করে দিয়ে ঝড় আসে, বুনো জানোয়ার ঘুরে বেড়ায়, বেতবনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে ঝিমন্ত পাহাড়ী অজগর—তার মধ্যেই ওদের দিন কাটে। সুখে-দুঃখে, প্রেমে-বিরহে এবং সজ্ঘাতে জান্তব জীবন।

কিন্তু এমন যে মানুষগুলো আজ তারাও ঘরের মধ্যে গুটিসুঁটি হয়ে বসে আছে।

ডান দিকে উঁচু পাহাড়—তার মাথা হাল্কা তুষারে ধূসর। বাঁ পাশে পাহাড়ের গা প্রায় খাড়াই হয়ে হাজার দেড়হাজার ফুট নীচে নেমে গেছে—সেখানে একটা রাক্ষুসে মাথার উচ্ছৃঙ্খল কোঁকড়ানো চুলের মতো কালো জঙ্গল—তরাইয়ের অরণ্য-সীমা। আজ সেই তুষারধবল পাহাড়ের চূড়োর উপর একটা ঝাপসা কুয়াশা এসে জমেছে—সেটা যেন হারিয়ে গেছে দৃষ্টির আড়ালে। নীচে তরাইয়ের জঙ্গল দেখা যাচ্ছে না—খাড়াই পাহাড়ের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় খানিকটা সাদা ধোঁয়া যেন ঘূর্ণির মত ঘুরপাক খাচ্ছে।

থম্‌থমে আকাশ—এক-একটা দমকা বাতাসে বৃষ্টির রেণু। আজ তুষার পড়বে। দুর্যোগের সম্ভাবনা যেন চারদিকে ঘনিয়ে রয়েছে।

নিতান্ত দায়ে না পড়লে এমন দিনে পাহাড়ীরাও বাইরে বেরুতে চায় না। ঘরের ভেতরে বড় বড় শাল গাছের গুঁড়ি বা 'কুঁদো' জ্বালিয়ে গোল হয়ে বসে আছে তারা। এবার অসময়ে বড় বেশী শীত পড়েছে, ধেনোমদ আর বিড়ির সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোচনাই চলছিল।

এমন সময় বাইরে শব্দ উঠল : ডুগ্—ডুগ্—ডুগ্—

চঞ্চল হয়ে পাহাড়ীরা কান পাতল। একি সত্যিই! কিন্তু না—ভুল হওয়ার কোনো কারণ নেই। শীত-বাষ্পে আচ্ছন্ন ভারী বাতাসের নীচে অবরুদ্ধ গলার আর্তনাদের মতো বাজতে লাগল : ডুগ্—ডুগ্—ডুগ্—

পাহাড়ীদের মুখের রেখাগুলো বদলে গেল মুহূর্তে। ভয় আর সংশয় ফুটে উঠল স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ হয়ে। গুম্ফা লামা। এদেশের দুর্বোধ্য রহস্য এবং দুর্বোধ্য ভয়। সে মানুষ কিংবা অপদেবতা অথবা আর কিছু, এ সম্বন্ধেই যথেষ্ট সন্দেহ তথা সংশয় আছে। তার আবির্ভাবের মধ্যে যেন অশরীরী কিছু একটা প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে—কোনো দুর্যোগ, কোনো দুর্বিপাক।

—ডুগ্—ডুগ্—ডুগ্—

অনিবার্য আহ্বান। একে একে কুটিরের বাইরে সার দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। সামনে দাঁড়িয়ে গুম্ফা লামা। নানা রঙের উলের টুকরো সেলাই করা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন জরাজীর্ণ আলখাল্লা। দুই কানে দুটো প্রকাণ্ড রূপোর মাকড়ী—কুণ্ডল। ঝুলে পড়া মুখের চামড়া—শীতে, বৃষ্টিতে আর বয়সে ট্যানকরা সেই বেগুনী চামড়ায়

অসংখ্য কিলবিলে রেখা। একহাতে ডুগডুগি, তাতে তিনচারটে নানারঙের লাল সবুজ হলদে রঙের কাপড়ের টুকরো ঝুলছে। আর একহাতে নর-করোটির ভিক্ষাপাত্র।

ঝাপ্‌সা ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে অমানুষিক মানুষ। পাথরের মতো ভাবের চিহ্নমাত্রহীন প্রকাণ্ড মুখে দুটো চোখ আগুনের টুকরোর মতো জ্বলছে, সে চোখের দিকে তাকাবার মতো ধৃষ্টতা বা দুঃসাহস নেই কারো। নর-কপালের ভিক্ষাপাত্র বাড়িয়ে দিয়ে সে মূর্তির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে—আর তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রকাণ্ড কুকুর। ঝাকড়া লোমওলা পাহাড়ী কুকুর নয়—নীচের থেকে সংগ্রহ করে আনা বাংলা কুকুর। সাদায় লালে মেশানো বাঘের মতো রং, বাঘের মতো তেজী আর ভয়ানক। শীতে তার গায়ের লোমগুলো সব কাঁটার মতো খাড়া হয়ে আছে, পিঠের ওপরে গোল হয়ে আসা লেজটা নড়ছে টুকটুক করে।

কোনো খানে কারো মুখে একটি কথা নেই। শুধু আস্তে আস্তে গুম্ফা লামার করোটি-পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠল। তারপরে আবার ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্। ঘন হয়ে আসা কুয়াশায় শুধু দেখা গেল গুম্ফা লামা আর তার কুকুরের প্রেতচ্ছায়াটা একটা উতরাইয়ের মাথায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

পাহাড়ীরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

—এই সময়ে গুম্ফা লামা।

আর একজন ভয়ার্ত মুখে বললে, নিশ্চয় ভয়ানক কিছু একটা ঘটবে।

—আচ্ছা, লোকটা সত্যি-সত্যিই মানুষ তো?

সে কথায় কেউ জবাব দিলে না। জবাব কেউ জানত না।

কিন্তু ওরা যে যাই বলুক, গুম্ফা লামা সত্যি-সত্যিই মানুষ। তবে কতদিনের যে মানুষ সে কথা গুম্ফা লামার নিজেরও স্মৃতি থেকে বোধ হয় মিলিয়ে গিয়েছে। ভাবলেশহীন মুখ, ভাবলেশ-বর্জিত মন। অতীতটা পাঁচ হাজার ফুট গভীর একটা খাদের মতো অন্ধকার—ভবিষ্যৎটা পাহাড়ের বুকে ঘনিয়ে আসা সাদা কুয়াশার মতো অস্পষ্ট।

পাহাড় বেয়ে বেয়ে অনেকখানি উতরাইয়ের পথ উঠে একখানা প্রকাণ্ড গ্র্যানাইটের চাঙাড়ের ওপরে দাঁড়ালো গুম্ফা লামা। বহুদূরে আর বহুনীচে বোধ হয় 'বাতাসিয়া' লুপ ঘুরে ঘুরে চলেছে দার্জিলিঙের রেলগাড়ি। পাহাড়ের গায়ে গায়ে গুম্ গুম্ করে তার শব্দ উঠছে। বার কয়েক তীক্ষ্ণ বাঁশির সুর কানে ভেসে এল। অকারণে একটা তীক্ষ্ণ হিংসায় গুম্ফা লামার মুখের মধ্যে দাঁতগুলো কড়াকড় করে বেজে উঠল।

কী ইচ্ছে করে? ইচ্ছে করে পাহাড়ী ঝর্ণার আঘাতে যেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঙাড় রেললাইনের মাথার ওপরে নিরবলম্বভাবে ঝুলে রয়েছে, ওরি একটাকে এক ধাক্কায় নামিয়ে নীচে আছড়ে ফেলে দিতে। আর পরক্ষণেই একটা ভয়ঙ্কর শব্দ। ছোট রেলগাড়িটা গুঁড়ো হয়ে গিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে হাজার হাজার ফুট গভীরতার মধ্যে গড়িয়ে পড়বে। শুধু মুহূর্তের জন্য শোনা যাবে মানুষের প্রবল আর্তনাদ, আর তারপরেই একেবারে সব ফাঁকা।

কিন্তু কেন?

গুম্ফা লামা নিজেই জানে না। শুধু এইটুকুই জানে কাউকে তার প্রয়োজন নেই, তাকে দিয়েও কারো কোনো দরকার নেই। কত-

কাল ধরে সে একা, আশ্চর্যভাবে নিঃসঙ্গ। মানুষ তাকে দেখে ভয় পায়—তাকে দেখে আঁতকে শিউরে উঠে। মাঝে মাঝে নিশীথ রাত্রে যখন পাহাড়ীদের পাড়া থেকে ঝমর ঝমর করে ঝাঁকড়ীর শব্দ কানে আসে, ভূত আর অপদেবতা তাড়াবার জন্যে উদ্দাম চিৎকার করে ওরা, তখন গুম্ফা লামার মনে হয় যেন ওই ঝাঁকড়ীর শব্দ অশরীরী কাউকে তাড়া করে আসছে না—ছুটে আসছে তারই পেছনে পেছনে। মানুষ তার শত্রু।

গুম্ গুম্ শব্দ করে রেলগাড়ি চলেছে—ঘুরে ঘুরে চলেছে পাহাড়ের কোলে। কোথায় যায় রেলগাড়ি—সে কেমন দেশ? গুম্ফা লামা মনে মনে ছবি দেখে: বাঁধানো পথ, বড় বড় বাড়ি, বিজলীর রোশনাই, মোটরের ভেঁপু। কোনোদিন কি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের পথ বেয়েই সে ওখানে গিয়ে পৌঁচেছিল?

—ঘর্-র্-র্—ঘেউ উ-উ-

গুম্ফা লামার পেছনে কুকুরটা হঠাৎ গজরে উঠল—চমক ভেঙে গেল মুহূর্তে। পাহাড় বেয়ে বিদ্যুৎগতিতে অজগর নেমে যাচ্ছে। বিরাট শরীর বয়ে চলেছে ঝড়ের মতো আলোড়ন জাগিয়ে, পাথরের টুকরো ছিটকে পড়ছে চারদিকে। কুকুরের ডাক সে শুনতে পেল কিনা কে জানে, কিন্তু চক্ষের পলক পড়তে না পড়তেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

যেন গুম্ফা লামারও মনের ভেতর দিয়ে অমনি করে সাপ নেমে গেল একটা। আকাশে মেঘের পরে মেঘ—সাদা কুয়াশা দমকা হাওয়ায় পাক খাচ্ছে—চোখে-মুখে লাগছে শীতের তীব্র চাবুক। লক্ষণ ভালো নয়। দুর্যোগের আসন্ন সম্ভাবনা দিকে দিকে।

পাহাড়ের চূড়া থেকে গুম্ফা লামা যেখানে নেমে এল সেখানে

সামনেই একটা কালো গহ্বর। এই গহ্বরে বা গুম্ফাতে বাস করে বলেই তার এই নামকরণ হয়েছে। বহুকাল আগে কোনো খেয়ালী পাহাড়ী ঝর্ণা নেমেছিল এই পথ দিয়ে, তারপর বহুকাল আগেই শুকিয়ে গিয়েছে। এই পাথরকাটা গুহাটা তারই গতিধারার চিহ্ন। কিন্তু ঝর্ণা এদিক দিয়ে আজকাল আর আসে না—শুধু গুম্ফা লামার আশ্রয়টাই স্থায়ী হয়ে আছে।

গুহায় ঢুকে গুম্ফা লামা প্রথমেই কাঠ-কুটরো দিয়ে খানিকটা আগুন জ্বালালো। গুহার শ্যাওলা সবুজ অসমতল গা থেকে কন্‌কনে পাথুরে ঠাণ্ডা বেরুচ্ছে, মোটা কম্বলের ছেঁড়া স্তূপের ভেতর দিয়ে ঠেলে উঠছে শীত। আগুনের আভায় দেখতে দেখতে গুহার সংক্ষিপ্ত পরিসরটা তীব্র রক্তোজ্জ্বল হয়ে উঠল, ভেতরের ধোঁয়া বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘনীভূত কুয়াশার ব্যূহ ভেদ করতে। গুম্ফা লামার রেখায়িত বেগুনী মুখখানায় লাল আলো পড়ে চীনা ভাস্কর্যে গড়া ব্রোঞ্জের বুদ্ধ-মূর্তির মতো দেখাতে লাগল।

ছেঁড়া কম্বলের ওপর ধ্যানস্থ হয়ে বসল গুম্ফা লামা—পায়ের কাছে ঘন হয়ে বসল তার কুকুরটা। মাথার মধ্যে যেন এখনো রেল-গাড়ির শব্দটা বেজে উঠছে গুম্ গুম্ করে। স্বপ্ন নয়—ওই দার্জিলিং শহর, ওখানকার আলো, ওখানকার পথ, মোটর—সবই সে একদিন দেখেছিল বাস্তব চোখেই। তারপর—

তারপর ঃ মনটা উড়ে চলে গেল প্রায় ত্রিশ বছর আগেই। বেশ সুখেই ছিল, অনেক কষ্টে বিয়ে করেছিল বরাশ ফুলের মতো সুন্দরী একটা মেয়েকে। কী নাম, কী যেন নাম ছিল তার ?

মাইলি।

হ্যাঁ—মাইলিই তো। গুম্ফা লামার বুকের ভেতরেও যেন

সামনেকার আগুনটার মতো পট্ পট্ শব্দে কী পুড়ে যেতে লাগল। সেই মাইলি। পাগলের মতো ভালো বেসেছিল—এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে পারত না তাকে। অথচ মাইলি—তার এত কামনার ধন—শেষ পর্যন্ত রাত কাটাতে আরম্ভ করলে কুঁজো কালো একটা বাঙালীর সঙ্গে।

তারও পর: শানানো কুকরির ঝলক। হিমালয়ের বুকে মেঘভাঙা চাঁদের আলো ঘরে এসে পড়েছে কাচের জানলা দিয়ে। মাথাটা ধড় থেকে ছিটকে মেজেয় আছড়ে পড়ল আর একটা প্রচণ্ড আর্তনাদ করে মাইলি দৌড়ে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

কতদিন? ত্রিশ বৎসর। কিন্তু এখনো ভয় কাটেনি। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে রেলগাড়ি চলে, ওই গাড়ির যারা যাত্রী, তারা যেন তাকে দেখলেই চিনে ফেলবে—ধরে নিয়ে সোজা লটকিয়ে দেবে ফাঁসিতে। আর মাইলি? মাইলি কী করে এখন? কার কোলে শুয়ে কাচের জানলার ভেতর দিয়ে দেখে সাদা পাহাড়ের চূড়োয় মেঘভাঙা চাঁদের আলো?

হঠাৎ চমকে উঠল গুম্ফা লামা। পায়ের ওপরে একটা মাংসের উত্তপ্ত অনুভূতি—যেন সজীব দেহের ক্ষীণ কোমল হৃৎকম্পন। বুকের ভেতরে রক্ত ছলকে উঠল। ত্রিশ বছরের ওপার থেকে তার কোলের ভেতরে কে ফিরে এল? সেই বিশ্বাসঘাতিনী? ফুলের ভেতরে সেই সাপ?

কিন্তু কোথায় মাইলি? পায়ের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে কুকুরটা ঘুমুচ্ছে। ওর জীবনের একমাত্র সঙ্গী—একমাত্র সহচর। মাইলির চাইতে অনেক বেশী বিশ্বস্ত, অনেক বেশী অন্তরঙ্গ। গুম্ফা লামার নিভৃত নিঃসঙ্গতায় পৃথিবীর একমাত্র প্রেম।

ছোট একটা মেটে পাত্রে সে মাধুকরীর চাল ক'টা চাপিয়ে দিলে। গন্‌গনে আগুনের আঁচে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে উঠল ভাত। তাদের দু'জনের খাদ্য, দু'টি প্রাণীর সংসার। পায়ের কাছে ঘুমন্ত ক্ষুধার্ত কুকুরটা নড়েচড়ে মাথা খাড়া করে উঠে বসল।

পরদিন যখন গুম্ফা লামা কম্বলের ভেতর থেকে মুখ বার করলে, গুহার মধ্যে তখনো অন্ধকার। কাঠের কুঁদোটা হালকা আগুনের আলোয় তখনো ঝকমক করছে। জমাট বেঁধে আছে ধোঁয়ার রাশি। নিশ্বাস টানতে কষ্ট হয়—ধোঁয়ায় যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ড।

বাইরে শোঁ শোঁ শব্দ। এদিকের ছেঁড়া কম্বলের পর্দাটা জোর হাওয়ায় দুলছে—আসছে বৃষ্টির ছাট। ঝড় চলছে। বেতবনের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন—বাতাসে শাঁই শাঁই করে চাবুক পড়ছে একটা অকারণ আর নিষ্ফল আক্রোশে। শাল-পাইন-দেওদারের হাহাকার।

একবার মুখ বার করেই সে চমকে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে নিলে। তীব্র শীতের উত্তাল হাওয়ায় নাক-কান ছিঁড়ে যেন উড়ে যেতে চায়। গুর্‌ গুর্‌ করে বাজের ডাকের মতো একটা ভয়ঙ্কর শব্দ—সমস্ত গুহাটা কেঁপে উঠলো। কোথায় যেন পাথর খসে পড়েছে।

আজ আর বাইরে বেরুনো অসম্ভব।

ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে সে চুপ করে বসে রইল।

কুকুরটা উঠে বসল। ধনুকের মতো পিঠটাকে বাঁকিয়ে আড়-মোড়া ভেঙে নিলে বারকয়েক। ভোঁতা নাকটা দিয়ে তার কম্বল জড়ানো হাঁটুটা শুঁকে নিলে দু'তিনবার, কুঁইকুঁই করে একটা

অব্যক্ত শব্দ করতে লাগল। কালকের খাবার দু'জনের পক্ষেও যথেষ্ট ছিল না—তার খিদে পেয়েছে।

খিদের আগুন জ্বলছে গুম্ফা লামার পেটের ভেতরেও। কিন্তু উপায় নেই। বাইরে প্রলয় চলেছে—আদিম হিমালয়ের বুকে আদিম হিংস্রতার আক্রোশ। যেন হাজার হাজার পাহাড়ী অজগর একসঙ্গে ফুঁসে উঠছে, তাদের বিষ-বাষ্প উড়ে চলেছে ঝড় হয়ে।

সুতরাং বেরুবার উপায় নেই। হয় ঝড়ে উড়িয়ে নেবে, নইলে হয়তো মাথার ওপরে গাছ উপড়ে পড়বে। উঁচু পাহাড়ের তুষার-মণ্ডিত চূড়োয় যে শুভ্রতার স্তূপ জমে আছে—একটা বিরাট ভাঙনের মধ্যে সেই শিলাস্তূপ নেমে এসে দুর্বিপাকও ঘটিয়ে দিতে পারে।

আস্তে আস্তে গুম্ফা লামা কুকুরটার মাথায় থাবড়া দিতে লাগল।

—চুপ, লালু চুপ। আজ আর কারো উপায় নেই, দেখছিস না? তোরও না, আমারও না। মিছিমিছি কেঁদে কী করবি?

কুকুরটা কী বুঝল সেই জানে। কিন্তু আবার পায়ের কাছে চুপ করে শুয়ে পড়ল। এমন বিশ্বস্ত, এত সহজে খুশি হয়ে গেল! অথচ মাইলি খুশি হয়নি কেন? সে তো সব দিয়েছিল—তার যতটুকু সাধ্য সব। কিন্তু মানুষ পোষ মানে না। সাপের মতো তার স্বভাব।

বাইরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। গুহার মধ্যে কুঁদোর আগুনটা নিবে আসছে—শুধু জ্বলজ্বল করছে দু' জোড়া চোখ। মানুষের নয়—জানোয়ারের মতো নীলাভ আর পিঙ্গল।

পেটের মধ্যে অসহ্য ক্ষুধা নিয়ে দু'টি প্রাণীর একটা দিন কেটে গেল।

আবার রাত শেষ হ'ল, কিন্তু সূর্য উঠল না। আজ আরো বেশী অন্ধকার—বাইরে আরো বেশী ঝড়ের দাপট। মড় মড় করে গাছ ভাঙার শব্দ আসছে, গুর্ গুর্ করে পাথর নামছে ভূমিকম্প জাগিয়ে। গুহার শ্যাওলা চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে জল, সে জল গায়ে লাগলে ঠাণ্ডায় ফোস্‌কা পড়ে যায়।

কুকুর আর মানুষ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে এক সঙ্গে। জন্তু আর জান্তব জীবন। খিদের কষ্ট সয়, কিন্তু অসহ্য শীত যেন হাড়ের পাঁজরাগুলোকে ঝমর ঝমর করে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে। সব চাইতে বিপদের কথা এই সঞ্চিত শুকনো কাঠগুলো সব ফুরিয়ে গেছে—নিভে গেছে কুঁদোর আগুন। গুহার ভেতরে যেন তুষার মেরুর তুহিনতা এসে জমাট বাঁধছে।

দাঁতে দাঁতে ঠক্‌ঠক্ করে বাজছে। লাল্লু, লাল্লু।

লাল্লু জবাব দিলে, কুঁই, কুঁই।

—বল্ তো কী করি?

লাল্লু শীতে যেন আরো ছোট হয়ে গিয়ে গুম্ফা লামার কম্বলের মধ্যে মাথা লুকোবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু না—আর পারা যায় না। খাবার না হোক, কিছু কাঠের জোগাড় করতেই হবে। সমস্ত শরীরের জড়তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গুম্ফা লামা উঠে বসল, হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল গুহার বাইরে।

ওই বেরিয়ে আসা পর্যন্তই। তীক্ষ্ণ হাওয়ায় ছুটে এল হাজারে হাজারে উড়ন্ত তরোয়াল, যেন সজোরে গুম্ফা লামার মুখের ওপর আঘাত করে গেল। মনে হ'ল নাক-মুখগুলো সব একসঙ্গে ফেটে গিয়ে টপ টপ করে রক্ত পড়তে শুরু করবে।

ভয়াতুর জানোয়ারের মতো ভেতরে পালিয়ে আসতে পথ

গেল মা গুম্ফা লামা। ভেতরের শীতে হাড়-পাঁজরায় ঝাঁকুনি দিচ্ছে, কিন্তু বাইরের শীত মুহূর্তে একেবারে পাথর করে দেবে।

আবার কম্বলের মধ্যে এসে চুপ করে বসে পড়ল গুম্ফা লামা। নাক-কান যেন আগুনে পোড়ার মত জ্বলে যাচ্ছে। কম্বলের ধারালো কর্কশ রোঁয়াগুলো ঘষে ঘষে মুখটাকে গরম করবার চেষ্টা করতে লাগল। এ কি হচ্ছে? বাইরের ঝড় কি আর থামবে না? আজ পঁচিশ বছরের মধ্যে এমন দুর্যোগ আর তার চোখে পড়েনি। মনে হ'ল পৃথিবী আর তাকে বাঁচতে দেবে না—চারদিকের হিম-শীতল শিলাস্তূপের মধ্যে সেও জমে পাথর হয়ে যাবে।

লাল্লু আরো ছোট হয়ে ক্রমে কম্বলের মধ্যে বেশী করে ঢোকবার চেষ্টা করছে। থাবা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে, তার নোখের ধারালো আঁচড় গুম্ফা লামার পায়ে এসে লাগল। যেন কম্বলের ভেতর থেকে তাকে আশ্রয়চ্যুত করে নিজেই সেখানে অধিকার বিস্তার করতে চায়। হঠাৎ গুম্ফা লামার মনে হল: পৃথিবী-শুদ্ধ সবাই লোভী, সবাই স্বার্থপর! আজ দার্জিলিং শহরে যারা দামী দামী পোশাকে আর লেপ-কম্বলের মধ্যে সর্বাঙ্গ ঢেকে ভালো ঘরের মধ্যে আরামে বসে আছে, যাদের চুলোয় গন্‌গন্‌ করছে কাঠ-কয়লার চমৎকার আগুন, চা আর কফির চুমুকের সঙ্গে সঙ্গে যাদের শিরায় শিরায় জীবন-বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে—সেই মানুষেরা, সেই মাইলি—; কিম্বা পাহাড়ীদের পাড়ায় ঘরের ভেতর শালের কুঁদো জ্বেলে পচাইয়ের জ্বলন্ত নেশায় শরীরকে যারা গরম রাখছে, তারা সবাই, একদলের, তারা সকলে সমানভাবে তার সঙ্গে শত্রুতা করছে। এমন কি কুকুরটাও।

লাল্লু একটা অব্যক্ত শব্দ করে কম্বলের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা

করছে। ছেঁড়া কম্বল একজনের পক্ষেই যথেষ্ট নয়। অতবড় একটা কুকুরকে তার ভেতরে আশ্রয় দিলে নিজেরই আত্মরক্ষার উপায় থাকবে না। জীবনে মাইলি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, আজ কুকুরটাও কি তাই করতে চায়?

অসহ্য ক্রোধে পা তুলে গুম্ফা লামা একটা লাথি বসিয়ে দিলে কুকুরটার পেটে। ঘ্যাঁক করে কাতর একটা শব্দ—দু' হাত দূরে ছিটকে পড়ল লাল্লু।

—আয়, আয় এদিকে।—দাঁতে দাঁত চেপে গর্জন করতে লাগল গুম্ফা লামা: খুন করে দেব একদম।

লাল্লু উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে শোনা যাচ্ছে তার বড় বড় নিশ্বাসের শব্দ।

বাইরে ঝড় চলেছে। সামনে হয়তো বা আরো প্রবল বেগে। এই গুহার বাইরে যে পৃথিবী ছিল—নিরবচ্ছিন্ন তুষার-ঝড়ের মধ্যে সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। হাঁটু পর্যন্ত জমে পাথর হয়ে উঠেছে যেন। কম্বলের খসখসে রোঁয়া ঘষে ঘষে গায়ের ছাল উঠে যাচ্ছে, কিন্তু এতটুকু উত্তাপও সঞ্চারিত হচ্ছে না শরীরের মধ্যে। গুহার গা বেয়ে আরো বেশী করে চুঁইয়ে পড়ছে বরফগলা জল। গুম্ফা লামা মরে যাচ্ছে—গুম্ফা লামা জমে যাচ্ছে। এতদিন পরে সত্যিই মরে যাচ্ছে গুম্ফা লামা, এই ষাট বছর পরে। মরতে দুঃখ ছিল না, কিন্তু এই সময়ে যদি মাইলিকে হাতের কাছে পাওয়া যেত—

যেন ঝিমিয়ে পড়ছিল—যেন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পায়ে তীব্র আঁচড় লাগল—শাণিত ধারালো নখের আঁচড়। গুম্ফা লামার চমক ভাঙল। লাল্লু ঢোকবার চেষ্টা করছে, প্রাণপণে

ঢোকবার চেষ্টা করছে। এই কম্বলে দু'জনের জায়গা হবে না—হয় জন্তুর, অথবা জান্তব মানুষের।

—লাল্লু!

প্রচণ্ড বেগে ধমক দিলে গুম্ফা লামা। কিন্তু চিরকালের আজ্ঞাবহ লাল্লু আজ তার আদেশ শুনল না। যেমন করে হোক সে ঢুকবেই।

আবার একটা প্রচণ্ড লাথি—আবার কুকুরটা ছিটকে পড়ল তিনহাত দূরে। কিন্তু এবারে আর কাতর আর্তনাদ নয়। লাল্লু স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তার পিঙ্গল চোখ দুটো বাঘের মতো ঝিকিয়ে উঠল নির্মম হিংসায়। যেমন করে পাহাড়ী অজগরকে দেখে সে গজরে উঠেছিল, তেমনি ভাবেই তার গলা দিয়ে এবার গর্জন উঠতে লাগল : গর্‌র্‌-র্‌-র্‌—

গুম্ফা লামা সোজা উঠে বসল এবারে। লাল্লুকে সে বুঝতে পেরেছে। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ আর নেই, এবারে দু'জনে দু'জনার প্রতিদ্বন্দ্বী। কুকুরটার মধ্যে জেগে উঠেছে তার আদিম পাশব হিংস্রতা। যেমন করে পাহাড়ী অজগরের ওপর সে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চায়, ঠিক তেমনি করে যেন তারও ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মারো কিংবা মরো।

অন্ধকারেও গুম্ফা লামা যেন দেখতে পেল, কুকুরটার লেজ নড়ছে, কান খাড়া হয়ে উঠেছে—উত্তেজিত নিশ্বাস পড়ছে, চোখ দুটোতে আগুন জ্বলছে। গুম্ফা লামার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। বাঘের মতো তেজী কুকুর—ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে তাকে।

—গর্‌র্‌-র্‌-র্‌!

আর সময় নেই। বিদ্যুৎবেগে গুম্ফা লামা হাতের কাছ থেকে

ভারী একটা পাথর তুলে নিলে, প্রাণপণ বলে ছুঁড়ে মারল কুকুরে
মাথায়। একটা কাতর আর্তনাদ করে কুকুরটা পড়ে গেল মাটিতে
গুম্ফা লামার শীতার্ত শরীরে যেন আগুন বয়ে যাচ্ছে। মুহূ
উঠে পড়ল সে, লাথির পর লাথি মেরে গুহার বাইরে ঠেলে দি
কুকুরটাকে। বাইরে ঝড়ের তরোয়াল তেমনি উড়ে চলেছে, কি
এবারে আর সে মুখের ওপর তার তীক্ষ্ণ স্পর্শ অনুভব করতে পার
না। দু'হাতে মাথার ওপর কুকুরটাকে তুলে ধরে সে ছুঁড়ে গড়ি
দিলে ঢালু পাহাড়ের গায়ে—যেখানে হাজার-দেড়হাজার ফুট নী
তরাইয়ের ঘন অরণ্য আবর্তিত বৃষ্টির কুয়াশায় দৃষ্টির বাইরে মিলি
গিয়েছে।

তারপরে এক ঘণ্টা সময়ও কাটল না। খেয়ালী পাহাড়ী ঝ
আপন খেয়ালেই থেমে গেল আকস্মিক ভাবে। পাহাড়ের মাথ
থেকে মেঘের জাল সরিয়ে দিয়ে হেসে উঠল দ্বিপ্রহরের সূর্য। তা
উষ্ণ মধুর আলো গুম্ফা লামার গুহার মাথায় শান্ত ভালোবাসা
মতো ছড়িয়ে পড়ল।

আর সেই সূর্যের দিকে তাকিয়ে পাথরের মতো স্থির হয়
দাঁড়িয়ে রইল গুম্ফা লামা। কানের কুণ্ডলে আর রেখা-সংকু
বেগুনী মুখের ওপর আলো ঝিকিয়ে উঠতে লাগল। কী করল
এ সে কী করল ?

আজ সে নিঃসঙ্গ। এতদিন পরে বিরাট পৃথিবীতে সে নিঃসঙ্গ
পাহাড়ের টিলায় উঠে গুম্ফা লামা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল
দূরে বাতাসিয়া লুপে রেলগাড়ির গর্জন শোনা যাচ্ছে। গুম্ গু

শুভ্র। সূর্যের আলোয় স্নান করছে পৃথিবী, পাহাড়ের চূড়ায় জ্বলছে যেন সোনার মুকুট।

বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। লালু—লালু! লালু তো মাস্কিলি নয়। তার জীবনের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র সান্ত্বনা। সে এ কী করল?

—লালু!

কাতর আহ্বান পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। কিন্তু লালু এল না, চিরদিনের বিশ্বস্ত কুকুর আজ আর সাড়া দিলে না মনিবের ডাকে। শুধু দূর বস্তিতে পাহাড়ীরা শুনতে পেল দিকে দিকে একটা অমানুষিক কণ্ঠস্বর বাজছে—লালু…লালু!

অতল স্পর্শ পাহাড়ের খাড়াই। তার নীচে তরায়ের কালো বন—সূর্যের আলোয় ভিজে বন জ্বলে উঠছে। গুম্ফা লামা স্থির অনিমেষ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল। ওখান দিয়েই লালুকে গড়িয়ে দিয়েছে—গড়িয়ে দিয়েছে নীচে। কিন্তু লালু কি সত্যিই মরে গিয়েছে? না, না, বিশ্বাস হয় না।

সূর্যের আলোয় পাথর গরম হয়ে উঠছে। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে গুম্ফা লামা অভ্যস্ত পদক্ষেপে নীচে নামতে লাগল। পাথর আঁকড়ে, গাছের শিকড় ধরে। তার মন বলছে, লালু মরেনি, ওইখানেই আছে, ওই জঙ্গলেই আছে। শুধু পাহাড় বেয়ে তার কাছে উঠে আসতে পারছে না।

—ভৌ উ-উ!

নীচে থেকে কুকুরের ডাক হাওয়ায় ভেসে এল। গুম্ফা লামার রক্ত চমকে উছলে উঠল। তরাইয়ের জঙ্গলে কুকুর ডাকছে। নিশ্চয় তারই লালু।

—ভৌ-উ-উ।

তর তর করে পাহাড় বেয়ে গুম্ফা লামা নীচে নামতে লাগল।

তরাইয়ের বৃষ্টি-ভেজা বনে তখন সন্ধ্যার ম্লানিমা। গুম্ফা লামা শুনতে পেলো কুকুর ডাকছে অবিচ্ছিন্ন উৎসাহে। ভৌ-উ-উ। তার লাল্লু,—তার লাল্লু কাঁদছে। কাছে আসতে চায়, আশ্রয় নিতে চায়। এবার আর লাল্লুকে আঘাত করবে না সে—লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দেবে না। কম্বলের উত্তাপে তাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে রেখে দেবে। লাল্লু মাইলি নয়। তার শেষ জীবনের সান্ত্বনা, তার অবলম্বন।

সন্ধান ব্যর্থ হ'ল না। তবে একটা কুকুর নয়—এক পাল।

পরদিন বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় একদল পাহাড়ী দেখতে পেলো গুম্ফা লামার ছেঁড়া পোশাকের টুকরো আর একরাশ রক্তমাখা হাড়। তাকে বন-কুকুরেরা খেয়ে ফেলেছে।

দুর্ঘটনা

কেবিনের সামনে ডেক চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে মনোযোগটা বারে বারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। স্টীমার চলতে সুরু করে দিয়েছে, কাঠের চাকায় উঠছে আহত জলের ক্ষুব্ধ আর ক্রুদ্ধ গর্জন। কচুরির ঝাঁক ছিন্ন ভিন্ন করে, আর জলে সমুদ্রের ঢেউ জাগিয়ে স্টীমার এগিয়ে চলেছে। সকালের রোদে নদীর জল কাচের গুঁড়োর মতো জলছে, ইলিশ মাছের সন্ধানে লম্বা জাল ছড়িয়ে নেচে চলেছে জেলে ডিঙির বহর।

হাতের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে তখন ঘটনার ভয়ঙ্কর আবর্ত। তিনটে খুন করে আর দুর্মূল্য পান্নার ড্রাগনটা হস্তগত করে দস্যু সর্দার ক্যাং চু পলাতক। বাঙালী ডিটেক্‌টিভ সমুদ্র রায় তাকে ধরবার জন্যে ইরাবতী নদী দিয়ে লঞ্চ ছুটিয়েছে পূর্ণবেগে। এমন সময় জলের তলায় প্রলয়ঙ্কর শব্দে কী ফাটল? চুম্বক মাইন? কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু মুহূর্তে ডিটেক্‌টিভ সমুদ্র রায় লঞ্চ থেকে—

উত্তেজনায় গায়ের লোমগুলো যখন দাঁড়িয়ে উঠতে যাবে ঠিক সেই সময় ইন্দিরা চৌধুরী অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বইটা মুখের সামনে ধরে কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করতে লাগল কথাগুলো। স্টীমারের অবিশ্রাম গর্জনের মধ্য দিয়েও সেই কল-কাকলি বেশ স্পষ্ট ভাবেই কানে আসতে লাগল।

ওরা দু'জনে দাঁড়িয়েছে ফ্রন্ট ডেকের রেলিং ধরে—ইন্দিরার দিকে পিঠ দিয়ে। সুন্দর ছেলেটি, আরও সুন্দর সঙ্গের মেয়েটি।

বিশৃঙ্খল হাওয়ায় ওদের চুল উড়ছে, শাড়ী উড়ছে, উড়ছে পাঞ্জাবির প্রান্তর। বাতাসে ভাসছে একটা মৃদু-মধুর সুরভি। ওরা এখন নিজেদের মধ্যে নিমগ্ন।

—সত্যি বড্ড খিদে পেয়েছে।—ছেলেটির গলা।

মেয়েটি ধমক দিলে: তুমি বড্ড পেটুক বিভাস। স্টীমারে ওঠবার আগে অতগুলো খেয়ে এলে না রেস্তোরাঁ থেকে? এখন আবার খেলে অসুখ করবে না?

—না, কিছুতেই না।—ছেলেটি জোর গলায় প্রতিবাদ করলে: জানো আমি ডাক্তার? আমাদের কখনো অসুখ করে না। সত্যি ইলু, তোমার টিফিন-ক্যারিয়ারের গলদা চিংড়িগুলো—

—আবার?—ইলু অথবা ইলা এবার কড়া ভাবে শাসন করে দিলে: ফের গলদা চিংড়ির নাম করেছ কি টিফিন-ক্যারিয়ার শুদ্ধু নদীতে ফেলে দেব। দশটার আগে একটুকরো কিছু খেতে পাবে না। ডাক্তার। ছাই ডাক্তার তুমি। এম্‌-বি পাশ করেছ খালি মানুষ মারতে।

শাসিত হয়ে বিভাস চুপ করে রইল। বোঝা গেল গলদা চিংড়ির ব্যাপারে সে নিরাশ এবং মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ইলা কোমল স্বরে বললে, সত্যি লক্ষ্মীটি, রাগ করো না। তোমার জন্যে খাবার আনা হয়েছে, তুমিই তো খাবে। আমি বলছিলাম—

স্টীমার বাঁক ঘুরছে একটা। অসতর্ক নৌকাগুলোকে জানান দেবার জন্যে প্রচণ্ড গভীর রবে বাঁশি বাজিয়ে দিলে দু'বার। কয়েকটা কথা তার মধ্যে হারিয়ে গেল, বাকী কথাগুলো তেমনি অখণ্ড মনোযোগে শুনে যেতে লাগল ইন্দিরা। নিজের ব্যর্থ শূন্য জীবনটা

পরিপূর্ণ যৌবন-সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে এখনো মাঝে মাঝে লোলুপ হয়ে ওঠে।

ইলা বলে যাচ্ছে : আচ্ছা, একটুকু কি রোমান্স নেই তোমার? বিয়ের পরে হনিমুন করতে চলেছ, কোথায় ভালো ভালো কবিতা মনে পড়বে, তা নয় গল্দা চিংড়ি আর গল্দা চিংড়ি।

—বোঝো না, মানুষ কেটে কেটে ভয়ানক রিয়্যালিস্টিক হয়ে গেছি। এখনো কবিগুরুর কবিতা মনে পড়ে বৈকি, কিন্তু সে হচ্ছে :

"পাক-প্রণালীর" মতে কোরো তুমি রন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব সেরা বন্ধন।
চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত বলে দাবি নাহি করে মুচিটা,
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন—

—ওরে অকৃতজ্ঞ, কবে তোমাকে চামড়ার মতো লুচি খাইয়েছি?

—অনেকদিন।

—মিথ্যেবাদী, ছোটলোক—ইলার ঝঙ্কার। তারপর খানিকটা দাম্পত্য-কলহ, একঝলক মিষ্টি হাসি। সকালের রোদ, নদীর জল, নীলাঞ্জন আকাশ, স্টীমারের চাকায় জলের গর্জন, সব মিলে অপরূপ একটুকরো লিরিক্ কবিতা।

স্কুল মিস্ট্রেস কুরূপা মিস্ ইন্দিরা চৌধুরীর বুকের ভেতরটা অকারণে পুড়ে যাচ্ছে। রক্তের মধ্যে একটা চাপা আক্রোশ—স্টীমারের প্যাড্লের মতো অশ্রান্ত ঘাত-প্রতিঘাত। গালে-মুখে যেন একরাশ রক্ত-কণিকা এসে ঝিঁ ঝিঁ করছে। কোন্ ফাঁকে হাত থেকে রোমাঞ্চকর ডিটেক্টিভ উপন্যাসটা খসে পড়ল।

ওদের কাছে এখন সমস্ত পৃথিবীর রঙই আলাদা। আকাশ-

বাতাস, নদীর জল আর স্টীমারের বাঁশিতে যেন সানাইয়ের সুর উঠেছে। শরতের রোদে দিগন্তটা যেন বাসন্তী রঙের শাড়ী পরে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো এসে দাঁড়িয়েছে ওদের দৃষ্টির সামনে। স্টীমারের চাকায় তারই জল-তরঙ্গ। আর শুধু পৃথিবীই নয়—ওদের এই মিলনোৎসবে চারদিককার সমস্ত মানুষও যেন এসে যোগ দিয়েছে। যে-সমস্ত নিদ্রাতুর যাত্রী এই দিন-দুপুরেই ডেকের ওপর লম্বা হয়ে পড়েছে অথবা মুরগীর ঝোলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে যারা ঘোরাঘুরি করছে বাটলারের ঘরের সামনে, কিংবা এঞ্জিনের খোপরে ঢুকে যে-সব কালিমাখা খালাসী কয়লা ঠেলছে বয়লারের গোলাপী আগুনে—তারা আর কেউ নয়, এই আনন্দিত বরযাত্রারই সঙ্গী। তাই পোড়ামুখ কুৎসিত ইন্দিরা চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করে নিতেও দেরি হ'ল না ইলার।

ডেকে তিনজন। গল্প জমে গেল। কোথায় যাচ্ছেন, কী পরিচয়, কী করেন। বাড়িতে কে কে আছেন। কবে বিয়ে হ'ল। আশা করি, দাম্পত্য-জীবন মধুময় হয়ে উঠেছে। আপনাদের দেখে ভারী ভালো লাগল—একেবারে আইডিয়াল কম্বিনেশন যাকে বলে।

বিকেল হয়ে এসেছে। নদীর জলে ছড়িয়ে পড়েছে রাঙা আলো। ইলার সুন্দর মুখে সেই আলো এসে অপরূপ মায়া ছড়িয়ে দিলে। আর সেইদিকে একবার চোখ বুলিয়ে গল্প সুরু করলে ইন্দিরা:

—জানতে চেয়েছেন আমার মুখটা এমন ভাবে পুড়ল কী করে। ওটা নিতান্ত অ্যাক্সিডেন্ট। কিন্তু ওকথা থাক। একটি মেয়ের গল্প বলি শুনুন। মনে করে নেবেন এটা সত্যি-সত্যিই গল্প—এর মধ্যে বাস্তব কিছু নেই।

বিভাস আর ইলা একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিলে। অর্থাৎ নিজের জীবনের কথাই বলতে যাচ্ছে ইন্দিরা। আত্মজীবনী অথবা বাস্তব ঘটনা বলবার রেওয়াজই এই, গোড়াতেই তাকে অস্বীকার করে নিতে হবে।

ইন্দিরা বললে, হ্যাঁ, নিতান্তই গল্প। স্টীমারে এর শুরু, স্টীমারেই এর শেষ। সুতরাং এর কিছুই বিশ্বাস করবেন না। মনে করবেন, শুধু সময় কাটানো ছাড়া এর আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

ইলার চোখ জ্বলজ্বল করছে আগ্রহে। বিভাস তাকিয়ে আছে সকৌতুক দৃষ্টিতে। দুজনেই সমস্বরে জবাব দিলে, আচ্ছা, বলুন আপনার গল্প।

স্টীমার চলেছে পূর্ণবেগে। আকাশে ম্লান হয়ে আসছে আলো। দুপাশের গ্রামগুলো যেন স্বপ্নের এক-একটুকরো ছবির মতো দেখাচ্ছে—উড়ে চলেছে গাং-শালিকের ঝাঁক, মাছরাঙারা পাখায়-গড়া হাল্কা দেহ নিয়ে ঝুপ্ ঝুপ্ করে ছোঁ মারছে জলে। জেলেদের জালে রুপোর মতো ঝলকাচ্ছে ইলিশ মাছ। নীচের থেকে আসছে স্টীমের আর খালাসীদের রান্নার একটা মিষ্টি মিশ্র গন্ধ।

ইন্দিরা বলতে শুরু করলে:

একটি মেয়ের গল্প। অসাধারণ কিছু নয়—সাধারণ মেয়ে। পথেঘাটে যাদের দেখা যায়, সংসারে যাদের সঙ্গে প্রত্যেকদিন সাক্ষাৎ, তাদেরই একজন। তাকে দেখলে কারো চোখ তার ওপরেই আটকে পড়ে না—অথবা চোখ ফিরিয়ে নেবারও দরকার হয় না। গ্রামে যারা তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালায় এবং শহরে এসে যারা লেখাপড়া শিখেও সহজভাবে একা একা পথ চলতে পারে না, এ মেয়েটি তাদেরই দলে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এসব কালো মেয়ের মুখে একটা চমৎকার লাবণ্যের আলো থাকে—অন্ততঃ প্রথম বয়সে। ঝকঝকে ফর্সা রঙ সে আলোকে ম্লান করে রাখে, কিন্তু শান্ত শ্যামলতার ভেতর দিয়ে তা ঠিকরে পড়ে প্রাণের আলোর মতো। ঘনিষ্ঠভাবে না মিশলে একে দেখা যায় না—যারা দেখে তারা আর ভুলতে পারে না। একটা জিনিস মনে রাখবেন। উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী মেয়ের প্রেমে যারা পড়েছে, তাদের আত্মরক্ষার সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু কালো মেয়েকে যারা ভালোবেসেছে, তাদের উদ্ধারের বিন্দুমাত্র আশা নেই।

আমি যে মেয়েটির কথা বলছি—ধরুন তার নাম লক্ষ্মী—এই লাবণ্যের আশীর্বাদ সে-ও পেয়েছিল। লেখাপড়া মন্দ করেনি, থার্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিল। তারপরে তার বিয়ে হয়ে গেল, যেমন করে এই সব মেয়েদের হয়। প্রেমে পড়ে নয়—সিভিল ম্যারেজে নয়, বাপ-মায়ের পছন্দ করা একটি সাধারণ বাঙালী ছেলের সঙ্গে। তার নাম মনে করুন সত্যেন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে চাকরি করে, কলকাতায় নিজের একখানা দোতলা বাড়ি আছে, আছে বাপ-মা, ভাইবোন। গল্পের নায়ক হবার মতো কোন গুণ নেই, না রোমিও, না ডন-জুয়ান। কালো রঙের একটি ছেলে, মাঝারি ধরণের বি-এ পাশ করে ঢুকেছিল চাকরিতে।

কিন্তু লক্ষ্মী সুখী হয়েছিল—সুখী হয়েছিল সত্যেনও। আপিস পালিয়ে দুপুরে সত্যেন আসত বাড়িতে, স্ত্রীকে নিয়ে যেত বিলিতী বায়োস্কোপে ম্যাটিনীর ছবি দেখতে। সন্ধ্যায় লেকের ধারে বসে 'হ্যাপি বয়' আইসক্রীম খেত, আউটরাম ঘাটের পাশে ছায়াঘেরা লোহার বেঞ্চিতে বসে বসে দেখতো রেঙ্গুনের জাহাজ আর গঙ্গায়

জলে দিনান্তের আলোর ঝলক। সূর্য ডুবে যেত; হাওয়ার আকাশে উঠত চাঁদ, গুন্ গুন্ করে লক্ষ্মী গান গাইত:

'যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে'—

বেশ কাটছিল, কিন্তু কাটল না। সত্যেনের দেখা দিল প্লুরিসি—তারপর প্লুরিসি থেকে যক্ষ্মা।

ইন্দিরা চশমার কাচ মুছে নেবার জন্যে চুপ করলে এক মুহূর্তের জন্যে। নদীর পূর্ব পারে গ্রামগুলোকে অস্পষ্ট করে দিয়ে নেমেছে সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে এখনো জ্বলন্ত তামার রক্তরাগ। স্টীমারের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। সার্চলাইটের আলো দূরে নারিকেল বীথি সমাকীর্ণ নদীর বাঁকটাকে উদ্ভাসিত করে দিলে। এদিকে ইলা আর বিভাস নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ইন্দিরার মুখের দিকে।

ইলার স্বরে বেদনা প্রকাশ পেল: যক্ষ্মা?

ইন্দিরা চশমাটা পরে নিলে। কাচের ওপরে ইলেকট্রিকের আলো পড়ে যেন ইন্দিরার চোখ দুটোই জ্বলতে লাগল: হাঁ, যক্ষ্মা। এসব কাব্যের এ-রকম বিয়োগান্ত পরিণতিও মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। কী করা যাবে, উপায় নেই।

চিকিৎসা চলতে লাগল—ব্যাঙ্কে সঞ্চিত যা-কিছু দিয়ে—লক্ষ্মীর গয়না বন্ধক দিয়ে। কিন্তু কোন লাভ নেই—সকলেই বুঝতে পারছিল যা অনিবার্য তাই ঘনিয়ে আসছে। লক্ষ্মীর মনের অবস্থা আপনারা অনুমান করতে পারেন, সে সম্বন্ধে কোন কথাই আমি বলব না। তবু যখন একবিন্দু আশা থাকে না—তখনো মানুষ আশা করতে ছাড়ে না। হয়তো লক্ষ্মীর ক্ষেত্রেও তাই হয়ে থাকবে।

কিন্তু আশ্চর্য, সবাই যখন ভরসা ছেড়ে দিয়েছে, তখন আরো বেশী করে ভরসা পাচ্ছে সত্যেন। এ রোগের নাকি ধর্মই এই।

তার ধারণা সে সম্পূর্ণ সেরে গেছে, এখন আর ভয়ের কোনো কারণ নেই। বাস্তবিক, আগের চাইতে তার বাইরের স্বাস্থ্য সেরেও গিয়েছিল অনেকটা। সত্যেন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল: এভাবে আমাকে আলাদা করে রাখবার দরকার নেই, আমি সকলের সঙ্গে মিশব, সকলের সঙ্গে খাবো। লক্ষ্মীই বা এমন করে দূরে থাকবে কেন? আমার কাছে সে স্বচ্ছন্দেই আসতে পারে এখন।

শেষ কথাটাই সত্যেনের আসল লক্ষ্য। কিন্তু বাড়ির নতুন ডাক্তার—ধরা যাক তার নাম বিভাস—

বিভাস আর ইলা একসঙ্গে চমকে উঠল।—বিভাস?

ইন্দিরা হেসে উঠল: মনে করুন কাল্পনিক নাম। সামনে যাকে পাওয়া যায়, তাকে মডেল করে নিলে গল্প বলতে সুবিধা হয় না? তা ছাড়া বিভাস নামে আর একজন ডাক্তার থাকলে ক্ষতি কি?

ইলার মুখে প্রতিবাদ ঘনিয়ে এল, কিন্তু বিভাস কৌতুক বোধ করছিল। বললে, না, না, ক্ষতি নেই। আপনি বলে যান।

—কী বলছিলাম?—কৌতুকময় স্মিতহাস্যে ইন্দিরা একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে ইলার দিকে: লক্ষ্মীকে কাছে পাওয়ার জন্যে সত্যেন যেন দিনের পর দিন উন্মাদ হয়ে উঠতে লাগল। এটাও নাকি এ-রোগের আরো একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। ভেতরে যত ক্ষয়ে আসে, অতৃপ্ত ক্ষুধাগুলো তত বেশী তীব্র হয়। কিন্তু তরুণ ডাক্তার বিভাসের—ইন্দিরা একবার থামল: "বিভাসের কড়া নিষেধ—যে-কোনো রকম উত্তেজনা রোগীর পক্ষে মারাত্মক। সুতরাং লক্ষ্মীর স্বামী-সম্ভাষণের অধিকার ছিল না।

তা ছাড়া আরো একটু ব্যাপার ছিল—যা আর কেউ কিছু বুঝতে না পারলেও লক্ষ্মীর দৃষ্টি এড়ায় নি। দিনের পর দিন

রোগীর চিকিৎসায় নিঃস্ব হয়ে আসা এই পরিবারটির প্রতি জেগে উঠেছিল বিভাসের একটা অহেতুকী সমবেদনা। শেষ পর্যন্ত সে দুবেলা যাতায়াত করতে সুরু করলে। কী চাওয়া ত দূরের কথা, সে সম্বন্ধে কোনো কথা উঠলেই জিভ কেটে তিন হাত পিছিয়ে দাঁড়াত। বলত, না, না, টাকা আর কেন, এতো আমার কর্তব্যই—

দরিদ্র পরিবারটি তাতে অপমানিত হ'ল না, বরং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

কিন্তু নতুন ডাক্তার—বিশেষ করে তরুণ ডাক্তারদের কর্তব্য-বোধ ক্ষেত্র-বিশেষে মাঝে মাঝে মারাত্মক হয়ে ওঠে। না-না বিভাসবাবু, কিছু মনে করবেন না, এ কটাক্ষ আপনাকে নয়। এটা আমি সাধারণ ভাবেই বলেছি—একেবারে দায়িত্বহীন উক্তি বলেই আপনি এটাকে উড়িয়ে দিতে পারেন।

যাই হোক, কর্তব্যের তাগিদেই নতুন ডাক্তার একদিন এক ঝুড়ি ফল নিয়ে এল। লক্ষ্মী তখন দাঁড়িয়েছিল বারান্দার পাশে দিয়ে বিষণ্ন চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছিল, সামনের বড় গুন ছুঁইয়ে গেল ওপর রক্ত মাখিয়ে সূর্য অস্তে নামছে। হঠাৎ ফিরতেই কে তাকে আউটরাম ঘাটের সেই সন্ধ্যা, সেই ঝড় বুনো জানোয়ারের চোখ যাওয়া দূরের পথিক কালো কালো

বাঁশির সুর।

বিভাস বললে, আপনা তেমনি লোহার মত কঠিন দুহাতে একখানা আঁকা ছবির টেনে নিয়ে চলল। তার মধ্যে বহুদিনের

লক্ষ্মী চমকেগে উঠেছে।

বিভাসের চোখে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।—কী করছ, কী

বেশী চেনা—যেমন পাখী মাত্রেই বন্দুকের নল দেখলে চিনতে পারে।

বিভাসের মুখ কালো হয়ে উঠছিল। হঠাৎ যেন তীব্রভাবে বলে ফেলল, থাক, আপনার গল্প আর ভালো লাগছে না, মিস চৌধুরী—মাপ করবেন।

কিন্তু ইলেকট্রিকের আলোয় ইলার মুখের চেহারাটাই যেন বদলে গেছে আশ্চর্যভাবে। তেমনি তীব্র ভাবেই ইলা বললে, না, না, বেশ লাগছে। বলে যান আপনি।

বিভাস কিংবা ইলা কারো কথাই যেন শুনতে পায়নি এইভাবে ইন্দিরা বলে চলল: "বিদ্যুৎগতিতে চলে যাচ্ছিল লক্ষ্মী, কিন্তু বিভাস তার পথ আটকালে। বললে, আপনার স্বামীর জন্তে এই জল—

মাকে দেবেন—তীক্ষ্ণ গলায় জবাব দিয়ে লক্ষ্মী চলে গেল।

শাশুড়ীকে বিভাস কী বলেছিল কেউ জানে না, কিন্তু আড়ালে …কে খানিকটা গালি-গালাজ করলেন। বললেন, বৌমা, দৃষ্টি বুলিয়ে … তেমনি ঘরের ছেলে। এই দুঃসময়ে কত কী সজ্জোন যেন দিনের প… মান করলে কেন?

নাকি এ-রোগের আরো …াব দিবার কিছু ছিলও না। বিভাসের আলে, অতৃপ্ত ক্ষুধাগুলো তত …রিবারটি কেমন করে দিনের পর দিন বিভাসের—ইন্দিরা একবার থাম… আত্মসমর্পণ করছে, এ তো সৈ যে-কোনো রকম উত্তেজনা রোগীর পক্ষে …সের বিরুদ্ধে একটি মন্তব্য স্বামী-সম্ভাষণের অধিকার ছিল না। … ওপর খড়্গহস্ত হয়ে

তা ছাড়া আরো একটু ব্যাপার ছিল—যা … বুঝতে না পারলেও লক্ষ্মীর দৃষ্টি এড়ায় নি। … উঠছে। তার

মনের মধ্যে আগুনের মত জ্বলে যাচ্ছে লক্ষ্মীকে কাছে পাওয়ার কামনা। খাবারের বাটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আছড়ে ভেঙে ফেলে ওষুধের গ্লাস। জাগরণক্লান্ত রাত্রিতে জানালায় বসে বসে লক্ষ্মী শুনতে পায় খাঁচায় আটকানো একটা বুনো জানোয়ারের মতো সত্যেন ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

সেদিন জ্যোৎস্নায় বান ডেকে গিয়েছিল। নিশীথরাত্রে কলকাতায় মাঝে মাঝে অদ্ভুত চাঁদ উঠে। দিনের সমস্ত শব্দ আর সমস্ত কুশ্রীতা যায় তলিয়ে, শান্ত-স্তব্ধ-কোমল ঘুমের ওপরে জ্যোৎস্না যেন ফুলের পাঁপড়ির মতো ঝরে পড়তে থাকে। কিন্তু ঘরের মধ্যে মানুষ তখন ঘুমে কাতর—জ্যোৎস্নার সেই ফুল তারা কুড়িয়ে নিতে পারে না। আর লক্ষ্মীর মতো যারা সেই সব রাত্রিতে প্রহর জাগে, তাদের চোখে সে জ্যোৎস্না যেন দেখা দেয় কঙ্কালের খানিকটা হাসির মতো—আসন্ন বৈধব্যের নির্মম নিষ্ঠুর শুভ্রতার মতো।

রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল লক্ষ্মী। গালের দুপাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। এমন সময় তার ঘাড়ে আগুন ছুঁইয়ে গেল একটা নিশ্বাসের হলকা। চকিত হয়ে পেছন ফিরতেই কে তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকে চেপে ধরলে। বুনো জানোয়ারের চোখ জ্বলছে ধক্ ধক্ করে—সত্যেন।

লক্ষ্মী বললে, একি, তুমি!

সত্যেন জবাব দিল না। তেমনি লোহার মত কঠিন দুহাতে তাকে আঁকড়ে ধরে ঘরে টেনে নিয়ে চলল। তার মধ্যে বহুদিনের উপবাসী পশুটা জেগে উঠেছে।

লক্ষ্মী প্রাণপণে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।—কী করছ, কী

করছ তুমি পাগলের মতো? সর্বনাশ হয়ে যাবে যে।" পায়ে পড়ি তোমার, আজ ছেড়ে দাও। তোমার শরীর সেরে উঠুক—

সত্যেন তবুও জবাব দিল না। তার গায়ে যেন পাঁচটা হাতীর বল এসেছে। লক্ষ্মীর কান্না-মিনতি কিছুই তার কানে গেল না, সে পাগল হয়ে গেছে। স্ত্রীকে দুহাতে তুলে সত্যেন ঘরে নিয়ে এল।

ফলাফল রাতারাতিই টের পাওয়া গেল। শেষবারের মতো এক ঝলক রক্ত তুললে সত্যেন। লক্ষ্মীর কাছ থেকে এ জন্মের শেষ পাওনা আদায় করে সে চলে গেল—বিধবা হ'ল লক্ষ্মী।

ইন্দিরা থামল। নদীর বুকে গাঢ় অমাবস্যার রাত্রি। হু হু করে হাওয়া আসছে। সার্চ-লাইটের আলো তেমনি চমক ফেলছে নিশীথের তরঙ্গিত খরধারায়, দু' তীরের মর্মরিত সুপারি আর নারিকেলের বীথিতে। বিভাসের মুখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত—ইলার মুখে সমবেদনার ম্লান রেখা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলা বললে, গল্প শেষ হ'ল আপনার?

—না, হ'ল আর কই? এসব সাধারণ গল্প—প্রতিদিনের সংসারের গল্প। এর আরম্ভ নেই, শেষও নেই। যেমন করে প্রত্যেকদিনের জীবন চলে, এ গল্পও তেমনি খাওয়া-বসা, চলা-ফেরায় এগিয়ে চলতে থাকে। তবু আর একটুখানি বলেই আমি গল্পটা শেষ করব, আপনাদের আর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না।

ইন্দিরা বলতে লাগল: "লক্ষ্মী বিধবা হ'ল। বাঙালীর ঘরের শাশুড়ীরা ছেলের শোকে যেভাবে চীৎকার করে কাঁদেন, সত্যেনের মাও তেমনি করে কাঁদতে লাগলেন, তেমনি করেই গাল-মন্দ দিতে লাগলেন অলক্ষণা ছেলের বউকে। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই যে রাক্ষসী জলজ্যান্ত স্বামীকে এমন করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে,

তাঁর সাজানো সংসারে এমন ভাবে আগুন ধরিয়ে সব পুড়িয়ে শেষ করে দিতে পারে, তাকে তিনি যে একবিন্দুও ক্ষমা করতে পারেন না, এর মধ্যে অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক কিছুই নেই।

গালাগালি সহ্য করেও লক্ষ্মী পড়ে রইল স্বামীর ভিটে আঁকড়ে ধরেই, দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় বঁয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার প্রবৃত্তি সে বোধ করলে না। দিন কয়েক—দিন কয়েক কেন, মাস কয়েক কাটল একটা বিরাট শোকোচ্ছ্বাসের খণ্ড প্রলয়ের মধ্যে। কোনো ক্ষতিই কারো অপূর্ণ থাকে না—এও রইল না।

এদিকে সংসারের অবস্থা ক্রমেই অচল হয়ে আসবার উপক্রম করছে। ব্যাঙ্কে পুঁজি যা ছিল, সত্যেনের চিকিৎসাতেই তা শেষ হয়েছে। ঋণের বোঝাও ভারী হয়ে উঠেছে নেহাত মন্দ নয়। শ্বশুর যা পেন্‌সন পান তা নামে মাত্র, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। দেনার কিস্তি শোধ না করলে শেষ সম্বল বাড়িখানাও চলে যায়—আর বাড়ি বাঁচাতে গেলে মাসের দশদিন পরে উপোস দিতে হয় গুষ্টিশুদ্ধ সকলকে।

লক্ষ্মীর আই-এ পাশ করা বিদ্যাটা কাজে লাগল এতদিনে। পাড়ায় একটা ইস্কুলে ছোট মতন একটুখানি চাকরি সে যোগাড় করে নিলে। কাদায়-আটকে-বসা পারিবারিক চাকাটা নড়ে উঠল, চলতে সুরু করল একটু একটু করে। সংসারে অলক্ষণা বিধবা বউয়ের প্রতি গালি বর্ষণটা কমে এল, তার মূল্য বাড়ল, এমন কি খানিকটা আদরও জুটল বলা যায়। কোনো কোনো দিন ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখতো বুড়ি শাশুড়ী উনুনের আঁচে বসে তার জন্যে খাবার তৈরী করছেন।

দিন কাটছিল, হয়তো এমনি করেই কেটে যেত। লক্ষ্মী ভুলে

যেত নিজেকে, শ্বশুর-শাশুড়ী ভুলে যেতেন সংসার থেকে সত্যেনের ক্ষত চিহ্নটাকেও। তারপরে দূর ভবিষ্যতে হয়তো এও দেখা যেত যে একরকম করে নিজের মধ্যেই লক্ষ্মী সুখী হয়ে উঠেছে। জীবনের ধর্মই মানিয়ে চলা, স্বীকার করে নেওয়া—লক্ষ্মীর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হ'ত না।

কিন্তু যা হ'ত তা হ'ল না। এল রাহু। কর্তব্যপরায়ণ ডাক্তার বিভাস সত্যেনের মৃত্যুর পরেও এ বাড়িতে তার কর্তব্যকে ভুলতে পারল না।

সত্যেনের জন্যে আর ফলের ঝুড়ির দরকার নেই, কিন্তু শাশুড়ীর জন্যে আছে। বুড়ো বয়সে মিষ্টি খাবার লোভ হয় মানুষের, বিভাস বাক্স বোঝাই করে ভালো ভালো সন্দেশ আমদানি করতে লাগল। বিজয়ার দিনে অকারণে দশটাকার নোট দিয়ে শ্বশুরকে প্রণাম করে গেল। তিনি আপত্তি করলে বিভাস ম্লান মুখে বললে, আমাকে এমন পর করে দেখছেন কেন? সত্যেন আমার বন্ধু ছিল, তার শূন্য জায়গাতে আমার কি এতটুকু দাবি নেই?

বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে বিভাস। শ্বশুরের চোখে জল এল। তিনি বললেন, না বাবা, একজন গেছে, তার জায়গায় তোমাকে পেয়েছি খানিকটা অন্ততঃ। তোমাকে কি পর ভাবতে পারি কখনো?

কিন্তু সত্যেনের সব শূন্য স্থানেই বিভাস নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করতে লাগল, এমন কি লক্ষ্মীর ক্ষেত্রেও।

শ্বশুর-শাশুড়ী কিছু বুঝতে পারছিলেন কিনা তা কে জানে! যদিও বুঝে থাকেন তা হলেও বোধ হয় তখন তাঁদের করবার কিছু ছিল না। দারিদ্র্য আনে অপরিহার্য্য ক্ষুদ্রতাকে বহন করে—আনে

লোভ। আরো বিশেষ করে সে দারিদ্র্য যখন অসহায়—নতুন আশ্বাস আর নতুন উৎসাহে বুক বেঁধে চলবার ক্ষমতা যার নেই, সে চোখ বুজেই কোনো একটা অবলম্বনকে আশ্রয় করতে চায়। সেটা দড়ি, কিংবা সাপ একটা কিছু হলেই হ'ল—সাময়িক আশ্বাসটাই তার পক্ষে বড় কথা। লক্ষ্মী তখন শোনেনি, পরে জেনেছিল বিভাস শ্বশুরকে নাকি তিনশো টাকা ধার দিয়েছে এবং সে টাকা ফেরৎ পাবার জন্যে তার কিছুমাত্র তাগিদ নেই।

এমন হয়তো হতে পারে যে এই পরিবারটির উপরে বিভাসের খানিকটা মায়া বসে গিয়েছিল। কিন্তু দিনের পর দিন তা থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছিল তার লক্ষ্মীর প্রতি লোভ, একটা অপরিসীম লোলুপতা। আচম্কা ঘরে ঢুকে বলে বসত, বৌদি, অমন করে বসে আছেন কেন ? আসুন না, একটু গল্প করি।

খানিকটা পরিমাণে স্বীকার না করে উপায় ছিল না বিভাসকে। সে এখন এ বাড়িতে ছোট ছেলের মর্যাদা লাভ করেছে, লক্ষ্মীর পরম স্নেহভাজন দেবর। এবং দেবর হিসাবে খানিকটা বাড়াবাড়ির প্রশ্রয় সে নিশ্চয় পেতে পারে, এ সম্পর্কে কোন অনুযোগ জানাতে গেলে খানিকটা গাল-মন্দই লাভ হবে।

সেদিন রবিবারের ছুটি।

শ্বশুর-শাশুড়ি গেছেন গঙ্গাস্নান করতে। ছোট ছেলেমেয়েরা বাইরের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়িতে ভালুক-নাচ দেখছিল। আর স্নান শেষ করে এসে দোতলায় আয়নার সামনে চুল বাঁধছিল লক্ষ্মী।

এমন সময় আয়নায় ছায়া পড়ল। চোরের মতো নিঃশব্দ পায়ে বিভাস ঘরে চলে এসেছে। বললে, বৌদি।

রাগে লক্ষ্মীর চোখমুখ রাঙা হয়ে গেল।

—আপনি এমন ভাবে আমার ঘরে এলেন কেন?

—কেন, আসতে নেই?—বিভাস বেশ আরাম করে লক্ষ্মীর খাটের ওপরে জাঁকিয়ে বসল: সত্যি, যত দিন যাচ্ছে বৌদির রূপ তত বেশী খুলছে, যেন তপঃকৃশা পার্বতী।

অসহ্য ক্রোধে লক্ষ্মী বললে, আপনার স্তুতি আমার দরকার নেই। এমন অসময়ে আপনি আমার ঘরে আসবেন না—পাড়ার লোক দেখলে কী ভাববে বলুন তো?

—কী ভাববে?—বিভাসের মুখে শয়তানের হাসি ফুলে উঠল: কী ভাববে বল না লক্ষ্মীটি? সত্যি, লক্ষ্মী নামটা তোমার সার্থক।

লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল—জবাব দিল না।

—সত্যেনের জায়গা এ বাড়িতে আমি পেয়েছি। তার লক্ষ্মীকেই বা পাবো না কেন?—বলতে বলতে বিভাস উঠে দাঁড়াল, তারপর আলগা একটা টান দিয়ে লক্ষ্মীকে একেবারে বুকের ওপরে নিয়ে এল।

মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ্মীর সমস্ত শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে গেল, মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরুল না। পলকের জন্যে মনে হ'ল সে যেন মরে গেছে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেই। পরক্ষণেই একটা প্রবল ধাক্কায় বিভাস ছিটকে দেওয়ালের দিকে চলে গেল, সশব্দে ঠুকে গেল তার মাথাটা।

বিমূঢ় হয়ে বিভাস তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। বড় বড় নিশ্বাস পড়তে লাগল তার। চাপা কঠিন গলায় জবাব দিলে, বেশ।

সেই যে বিভাস লক্ষ্মীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—একমাসের মধ্যে এ বাড়িতে আর পা দিল না। আর লজ্জায় অপমানে

বিছানায় লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগল লক্ষ্মী, একথা কাউকে বলবার নয়, কেউ বিশ্বাস করবে না। বরং বৈধব্যের অপরাধে কলঙ্কের সমস্ত বোঝাটা তারই ঘাড়ের ওপরে চেপে বসবে।

কিন্তু বিভাসেরও দিন আসছিল। এল যথা সময়ে।

পাড়ায় ভয়ঙ্কর হাম হচ্ছে। বাড়িতে ছেলেপিলের হয়েছে, লক্ষ্মীরও হ'ল। যেমন তীব্র জ্বর, তেমনি তীব্র যন্ত্রণা। তিনটা দিন সে চোখ মেলেও তাকাতে পারল না—দেখতে পেল না তার চারি-দিকে কী ঘটছে বা না ঘটছে।

সেই সময়ে নিরুপায় শ্বশুর বিভাসকে ডেকে নিয়ে এলেন।

নতুন ডাক্তার, কর্তব্যপরায়ণ। সে ভালো ওষুধই এনে দিলে। প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন করে নয়, নিজের হাতেই ওষুধ নিয়ে এল। বললে, এইটে মুখে মাখিয়ে দেবেন, হামগুলো তাড়াতাড়ি উঠে যাবে, কোনো স্পট্‌ও থাকবে না।

মুখে ওষুধের তুলি পড়তেই আচ্ছন্ন অচেতন লক্ষ্মী অসহ্য যন্ত্রণায় উঠে বসল। সমস্ত মুখে কে যেন খানিকটা তরল আগুন বুলিয়ে দিয়েছে। আঙুল লাগতেই সঙ্গে সঙ্গে পোড়া চামড়া উঠে আসতে লাগল, বেরিয়ে পড়ল লাল টকটকে দগদগে ঘা। চিরদিনের মতো বীভৎস ভয়ঙ্কর হয়ে গেল লক্ষ্মী।

স্টীমারের বাঁশি হঠাৎ উচ্চকিত হয়ে উঠল। সামনে একটা বন্দরের ওপরে সার্চলাইটের দীপ্তি পড়েছে। ইন্দিরা উঠে দাঁড়াল। বললে, এই স্টেশনে আমি নামব। ধন্যবাদ, অনেক আনন্দ পাওয়া গেল আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে।

ইলা ব্যাকুল হয়ে বললে, দাঁড়ান, দাঁড়ান। ঘাটে লাগতে তো আরো কয়েক মিনিট দেরি আছে। তারপরে কী হ'ল বলুন।

স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে ইন্দিরা হাসল : কী আর হবে ? বিভাসের নামে কেস করা যেত। কিন্তু প্রমাণ তো করা চাই। ওষুধের শিশিটা যে সেই এনে দিয়েছিল কী করে বলা যাবে ? তা ছাড়া শ্বশুর-শাশুড়ীও কি চাইতেন ঘরের কেলেঙ্কারি নিয়ে খবরের কাগজে টানাটানি হয় ? তাঁদের না ছিল টাকা, না ছিল সহায়।

নিচে খালাসীদের চীৎকার—হাফিজ, হাফিজ। স্টীমার ঘাটে ভিড়েছে। শোনা যাচ্ছে মানুষের কোলাহল। ইন্দিরা বললে, আচ্ছা, নমস্কার।

—নমস্কার।

দোতলার সিঁড়ির মুখে কী ভেবে আবার থেমে দাঁড়ালো ইন্দিরা। মুখ ফিরিয়ে বললে, হ্যাঁ, আর একটা কথা। লক্ষ্মী শেষ খবর পেয়েছে বিভাসের সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। বেশ সুন্দর একটি মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে—এই আপনার মতোই অনেকটা।

সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ করে নেমে গেল ইন্দিরা।

বিভাস কাষ্ঠ হাসি হাসল : দেখছ ইলু, কী চমৎকার একটা গল্প বানিয়ে—

কিন্তু ইলা জবাব দিল না। দু-চোখে তীক্ষ্ণ অবিশ্বাসের আগুন ছড়িয়ে কেবিনে ঢুকে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিলে। কাতর বিভাস ডাকতে লাগল : ইলা, শোনো, শোনো—

স্টীমার থেকে নেমে ইন্দিরা হেঁটে চলেছে পথ দিয়ে। সত্যিই বানিয়ে বলা গল্প। নিজের সব ভেঙ্গে গেছে বলেই যা-কিছু সুন্দর দেখতে পায় তাকেই কি তার ভাঙতে ভালো লাগে ? তার মুখখানা পুড়ে গিয়েছিল কোনো ডাক্তারের অ্যাসিডে নয়, একটা স্টোভ দুর্ঘটনাতেই।

ফলশ্রুতি

মার্টিন কোম্পানির রেলের যে এত রহস্য আছে তা কে জানত!

বক্তিয়ারপুর জংশন ছেড়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দে সবে গোটা তিনেক স্টেশন এগিয়ে এসেছে, এমন সময় ছেঁড়া জিনের কোট পরে টিকিওলা বিহারী টিকেট কালেক্টার দর্শন দিলেন। দুঃসংবাদটা পাওয়া গেল তাঁর মুখেই। যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে তিনি জানালেন, এ গাড়ি তো রাজগীর যাবে না।

—তার মানে?—আমরা গাছ থেকে পড়লাম।

ততোধিক মিষ্টি ভাষায় তিনি জানালেন, এই ট্রেন যাবে বিহার শরীক্ পর্যন্ত।

পাণ্ডুর মুখে জিজ্ঞেস করলাম, তা হলে?

—তা হলে ঘণ্টা চারেক বিহার শরীফে বসে থাকতে হবে। তারপরে রাজগীরের ট্রেন পাবেন।

আশ্বাস দিয়ে ভদ্রলোক প্রস্থান করলেন।

চিন্তায় ম্লান হয়ে আমি আর অনু পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। সমস্ত প্ল্যানটাই গোলমাল হয়ে গেছে। এই গাড়িতে গেলে বেলা চারটের মধ্যে দিনের আলো থাকতে আমরা রাজগীর পৌঁছুতে পারতাম। বেলাবেলি ধর্মশালা খুঁজে নিতে কষ্ট হ'ত নাছে। বিকেলটা রাজগীরে কাটিয়ে পরদিন সকালের ট্রেনে নালান্দ চমৎকার পর দুপুরের গাড়িতে পাটনায় প্রত্যাবর্তন। অর্থাৎ আমরা রাজগীর আর নালান্দা সেরে নিতে চেয়েছি রাত্রের একটা

কিন্তু ব্যাপার যা দাঁড়ালো সেটা আশাপ্র

আমরা কখনো যাইনি—সেখানে চেনা কোনো লোক আছে বলেও জানি না। কুণ্ডস্নানের সময় এটা নয়, সুতরাং আকস্মিকভাবে কোনো বাঙালীর আতিথ্য যে পাওয়া যাবে এতখানি দৈববাদী হওয়াও শক্ত। এমন একটা বড় শহরও নয় যেখানে হোটেলে অবারিত দ্বার। সুতরাং এই রাত আটটার সময়ে সেখানে যে কী ব্যবস্থা করা যাবে সেটা ভাবতেই অস্বস্তি লাগছিল।

অনুকে বললাম, কী করা যায়?

পরম নিশ্চিন্তভাবে অনু জবাব দিলে, একটা কিছু হবেই।

—কী হবে?

—আঃ—তা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন? ওখানে গেলে নিশ্চয় একটা বন্দোবস্ত হবে। ত্যাখো—কী চমৎকার একটা পাহাড় —কী ছোট্ট! আচ্ছা, পাহাড়ের ওপরে ওটা কী? মন্দির, না?

সাধে কি পথি-নারী সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন! হতাশ হয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। কামরার বিহারী সহযাত্রীরা ততক্ষণে একটা চামড়ার প্রকাণ্ড ঝাঁকড়ী বাজিয়ে হোলির গান জুড়ে দিয়েছে আর ট্রেনের দুপাশে জলসিক্ত অড়রের ক্ষেত ছিটকে ছিটকে পেছনে সরে যাচ্ছে।

খাঁটি পশ্চিমা প্যাড়া আর পুরীর সঙ্গে বিহার শরীফে চা-পর্বটা জমল না। কিন্তু রাজগীরের ট্রেন যখন ছাড়ল তখন কৃষ্ণপক্ষের বানিয়ে দুপাশে তার কালো ডানা মেলে দিয়েছে। দেখতে দেখতে দেখতে পায় তাঁহিহারের মাঠ-ঘাট তলিয়ে গেল, আর অন্ধকারের পুড়ে গিয়েছিল সেটা সংশয়ে আমার মনটা পীড়িত হতে লাগল। দুর্ঘটনাতেই। া ঘরকুনো আর শান্তিপ্রিয় জীব। বাইরের

পৃথিবীতে ছুটে বেরোবার শখ আছে, কিন্তু সাহস নেই। অনিশ্চয় অ্যাডভেঞ্চার সব সময়ে আমাকে রোমাঞ্চিত করে তোলে না বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উদ্বিগ্ন করে। একা হলে ভাবনা ছিল না, কিন্তু রাতে আটটার সময় সস্ত্রীক কোথায় আশ্রয় হাতড়ে বেড়াব সেইটেই প্রকাণ্ড দুর্ভাবনা হয়ে উঠেছিল। পাটনাতেই শুনেছি রাজগীরের ধর্মশালা বাঙালীর প্রতি খুব অনুকূল নয়, আরো বিশেষ করে এই অসময়ে—

কিন্তু অনুকে কিছু বলা বৃথা। কালো অন্ধকারের দিকে বিভোর চোখ মেলে সে বোধ করি কবিতার খাদ্য খুঁজছিল। গদ্যময় স্বামীর জীবনে কবি স্ত্রীর মতো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আর কী হতে পারে!

আমার দুর্ভাবনাকে উপেক্ষা করেই ট্রেন পরমোৎসাহে ছুটতে লাগল। মার্টিনের গাড়ির চাকায় যেন মেলট্রেনের ছন্দ মিলেছে। একটার পর একটা স্টেশন পেছনে সরে যেতে লাগল, তারপর নক্ষত্র আর ছায়াপথের আলোয় আভাসিত দিগন্তে মাথা তুলে দাঁড়ালো জরাসন্ধের পুরী, বিম্বিসারের রাজধানী, ভগবান তথাগতের চরণ-ধন্য পঞ্চগিরির শিখরমালা—গিরিব্রজপুরী রাজগৃহ। তীব্র হুইসিলের শব্দ করে ট্রেন একটা বাঁক ঘুরল।

অনুকে বললাম, রাজগীর তো এল।

ছেলেমানুষের মত অনু খুশি হয়ে উঠল: ভালোই হয়েছে। ট্রেন থেকে নেমেই আমরা উষ্ণধারায় স্নান করে আসব। চমৎকার হবে—তাই না?

—চমৎকার তো হবে। কিন্তু তার আগে রাত্রের একটা আস্তানা—

ভর্ৎসনার দৃষ্টি মেয়েটি আমার মুখের ওপরে ছড়িয়ে দিলে: দু-পা তো যেতে হবে, এর জন্যে আবার কুলিকে পয়সা দেবেন নাকি! না পারেন বিছানাটাও আমিই নিয়ে নিচ্ছি।

সর্বনাশ—এ কী রকম মেয়ে! শশব্যস্ত হয়ে আমি বিছানাটাকে ঘাড়ে তুলে নিলাম। আর লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম অনুর চোখে সন্দেহ আর অপ্রীতির একটা কুটিল ছায়াভাস নেমে এসেছে।

আবার তাড়া এল: কই, চলুন। সারারাত দাঁড়িয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মেরই হাওয়া খাবেন মনে করেছেন নাকি?

লণ্ঠন হাতে আগে আগে চলতে সুরু করলে মেয়েটি, মন্ত্রমুগ্ধের মত আমরা তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। অপরিচিত দেশের অন্ধকার রহস্যে ঘেরা পাহাড়ের ভেতর থেকেই যেন এই রহস্যময়ী মেয়েটি বেরিয়ে এসেছে। কী একটা অপূর্ব অলৌকিক ক্ষমতায় সে মুহূর্তে আমাদের বশীভূত করে ফেলেছে কে জানে, কিন্তু তার ইচ্ছার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে যেন আমরা অচেতন অজ্ঞান সত্তার মতো এগিয়ে চলেছি। কেমন একটা আশ্চর্য অনুভূতি নেশার মতো আমার স্নায়ুর ওপরে ক্রিয়া করছিল। আমার পাশে পাশে চলছিল অনু। সে কী ভাবছিল জানি না, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই টের পেলাম তার ছোট হাতখানা আমার হাতের ভেতরে আশ্রয় খুঁজছে—ভয় পেয়েছে সে। আমাদের পেছনে পেছনে আসছে সেই প্রৌঢ়াটি, আগে কোনো কথা বলেনি, এখনো না—যেন স্তব্ধ একটা ছায়ামূর্তির মত নিষ্প্রাণ।

কিন্তু এ আমরা চলেছি কোথায়? প্ল্যাট্‌ফর্মের পাশ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে রেললাইন পেরুলাম। তারপরে দেখা দিল হাঁটু প্রমাণ বুনো আগাছার ঝোপ, এলোমেলো পাথরের টুকরো। এ

তো পথ নয়। মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা বিদ্যুৎশিখার মতো চমক দিয়ে গেল, স্বপ্ন উড়ে গেল হাওয়ায়। থেমে দাঁড়িয়ে আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম: কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বলুন তো?

মেয়েটি কিন্তু ফিরেও তাকালো না। সহজ প্রসন্ন স্বরে বললে, ভয় পাচ্ছেন বুঝি? কলকাতার মানুষ তো, এক মুঠো ঝোপ দেখলেই গণ্ডার আর গরিলার কথা ভাবতে বসেন। কিন্তু ভয় নেই, এসে পড়েছি—ওই দেখুন।—আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে তিন-চারটে আলো ভৌতিক চোখের মতো মিট মিট করছে।

কথার সূত্র ধরে বলে চলল, সোজা রাস্তায় এলাম কিনা। ঘুর-পথ হলে অনেকটা দূর পড়ত।

কথার ভঙ্গিটা বিস্ময়কর। অমার্জিত নয়, সহজ একটা শিক্ষা আর বুদ্ধির প্রতিধ্বনি তার ভেতরে শুনতে পাওয়া গেল। শুধু অনুভব করলাম আমার হাতের ভেতরে অমুর মুঠিটা ক্রমশ কঠিন আর ঘর্মাক্ত হয়ে উঠছে, আর পেছনে পেছনে তেমনি আসছে নির্বাক প্রৌঢ়া মহিলার ছায়ামূর্তিটা।

• • •

যেখানে এসে পথ শেষ হ'ল, সেটা কিন্তু ধর্মশালা নয়।

একখানা ছোট একতলা বাড়ি। ইটের দেওয়াল, ওপরে টালির ছাউনি। মেয়েটি চাবি দিয়ে ঘর খুলে ফেললে। তারপর অমুর দিকে ফিরে স্মিতমুখে বললে, একটা রাত তো? ধর্মশালার চাইতে এখানে বেশী কষ্ট হবে না।

—কিন্তু আপনিই বা কেন এভাবে মিছিমিছি কষ্ট করতে গেলেন? একটা ধর্মশালা দেখিয়ে দিলেই—

—পাগল হয়েছেন? এই রাত করে অচেনা-অজানা জায়গায়

কোথায় গিয়ে উঠবেন, আর চোরে সব লোপাট করে নেবে। আমাদের এ ঘরটা তো একেবারেই খালি, একটা রাত ঘুমুতে কোনো কষ্ট হবে না।

ঘরখানা শুধু খালিই নয়। পরিষ্কার আর ঝকঝকে। মেঝেতে কোনো তক্তাপোশ নেই, বোঝা গেল মাটিতে শোয়াই এদের অভ্যাস। দেওয়ালের একদিকে একখানা কালীঘাটের পট, আর একপাশে দড়ির ওপরে কতকগুলো শাড়ী। সামনে একটা মস্ত খোলা জানলা, তাতে শিক নেই। তার অবারিত ব্যাপ্তির ভেতর দিয়ে পাহাড়ের স্নিগ্ধ বাতাস হু হু করে ঘরের ভেতরে বয়ে আসছে।

আমি আর অনু শুধু পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করলাম।

পাশের ঘর থেকে এতক্ষণে প্রৌঢ়ার আওয়াজ পাওয়া গেল: নিরু, জল চাপিয়েছিস?

বোঝা গেল মেয়েটির নাম নিরু। নিরু বললে, তাহলে আপনারা হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিন। তারপরে কুণ্ডে স্নান করে আসবেন।

—এত রাত্রে কুণ্ডে স্নান!

—বাঃ, রাত্রেই তো ভালো। এখন গরম পড়ে গেছে না? দিনে কি আর কুণ্ডের জল ছোঁয়া যায় আজকাল? নিন, নিন, হাতমুখ ধুয়ে নিন। বারান্দাতেই জল আছে। কই বৌদি, কাপড়-চোপড় বদলাবেন না? চলুন, ও-ঘরে চলুন।

বৌদি! অনুর মুখের ওপর থেকে অস্বস্তির ছায়াটা সরে এল একটুখানি, এমনকি এক ঝলক হাসিও দেখা দিল। বললে, চলুন।

কয়েক মিনিট পরেই টের পেলাম স্টোভের শাঁ শাঁ শব্দ ছাপিয়ে ও-ঘর থেকে হাসি আর গল্পের কলগুঞ্জন উঠছে। মেয়েরা

কত সহজে যে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিতে পারে, আশ্চর্য।

আধঘণ্টার মধ্যে পাঁপড় সহযোগে চা চলে এল। নিয়ে এল নিরুই। বললে, দাদা, এখন আর বেশী খেতে দেব না। রান্না হয়ে যাবে একটু পরেই। চা-টা শেষ করে চলুন, কুণ্ড থেকে স্নান করে আসা যাবে।

চায়ের পেয়ালাটা টেনে নিয়ে এইবার আমি পূর্ণদৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে যেন বেহালার একটা তার ছিঁড়ে গেল ঝনাৎ করে—সুর কেটে গেল। আধো আলো আধো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে যাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না, একখানা ছাপা শাড়ী আর শ্যামবর্ণ ত্ব'খানি বাহুর ছন্দে যাকে আশ্চর্য স্বপ্নসঞ্চারিণী বলে মনে হচ্ছিল, বন্ধনহীন অলস কল্পনা যাকে নিয়ে ইচ্ছে মতো মূর্তি রচনা করে চলেছিল, সে এই। মেয়েটি সুন্দরী নয়—বরং কুৎসিতের সীমানা ঘেঁষেই চলেছে। রং ময়লা; মুখখানা অসম্ভব লম্বা, হাসলে খানিকটা বিবর্ণ মাড়ি বেরিয়ে পড়ে অসঙ্গতভাবে। যৌবনের লাবণ্য স্বাভাবিকভাবে যতটুক আলো ছড়িয়েছে, কোনোখানে তার বেশী এতটুকুও চোখে পড়ল না। শুধু প্রসন্ন উজ্জ্বলতায় বুদ্ধি-মার্জিত দৃষ্টিটা তার জলজল করছিল।

আমার মুখের ওপর চিন্তার অভিব্যক্তিটা কতখানি ফুটে উঠেছিল জানি না। কিন্তু নিরু হঠাৎ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বলে গেল, বৌদি স্নানের জন্যে তৈরী, আপনাকে পাঁচ মিনিটের নোটিশ দিয়েছেন।

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রাত সাড়ে নটা। ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে, একটু শুয়ে পড়তে পারলে

যেন বাঁচি। এত রাত্রে স্নান-পুণ্য অর্জন করবার মতো মনের অবস্থা আমার নয়। তা ছাড়া কাল অন্ধকার থাকতে নালান্দার ট্রেন ধরতে হবে, একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে নেওয়াও দরকার।

কিন্তু আমার ইচ্ছা আর অনিচ্ছা এখন বড় কথা নয়। কালো হোক, কুৎসিত হোক—তবু এই মেয়েটিই যেন আমার চিন্তা-চেষ্টা-চেতনার ওপরে একটা বিচিত্র প্রহেলিকার জাল বিস্তীর্ণ করে দিয়েছে। নিজের ইচ্ছায় এখানে আসিনি—নিজের ইচ্ছায় এখানে কিছু করাও যাবে না। কে এই মেয়েটি জানি না, কী তার পরিচয় তাও জানি না, শুধু এটুকু বুঝতে পারছি যেন আমি সম্মোহিত হয়ে গেছি। মন আর প্রশ্ন করতে চায় না, একটা নিরুপায় আত্মসমর্পণের ভেতরে সব মেনে নিতে চায়, সব স্বীকার করে নিতে চায়।

বসে বসে যে ভাবব, তারও কি যো আছে বেশীক্ষণ! আবার নিরুর প্রবেশ।

—কই, তৈরী হয়ে নিলেন না? আপনারা সাহিত্যিকেরা বড্ড কুঁড়ে মানুষ কিন্তু।

—সাহিত্যিক! কী করে জানলেন?

—বাঃ, বৌদির কাছে শুনলাম না! নিন, উঠুন এখন। এক রাতের জন্যে এসেছেন বলেই এমন চমৎকার উষ্ণ ধারায় স্নান করবেন না, এ হতেই পারে না।

নিরুত্তরে উঠে পড়লাম।

তিনজনে চলেছি স্নান করতে। চারদিকে তরল তমসার পরিব্যাপ্তি—দূরে কাছে পাহাড়ের শ্রেণী ধ্যানস্তিমিত হয়ে আছে বিস্মৃত ভারতবর্ষের বিলুপ্তপ্রায় স্বাক্ষর বহন করে। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন এক-একটা বাড়ি থেকে এক-এক টুকরো আলোর ঝলক

পড়ছে চোখে। রাশি রাশি উদ্দাম বাতাসে স্নিগ্ধ শীতের আমেজ। পায়ের তলায় মসৃণ পীচের পথ অগ্রসর হয়ে গেছে কুণ্ড পর্যন্ত।

অন্ধকারের ভেতরেও আঙুল বাড়িয়ে মেয়েটি বলতে লাগল: এদিকের নীচু পাহাড়ের গায়ে যে ভাঙা পাথরের প্রাচীর দেখতে পাচ্ছেন, এটা মহারাজ বিম্বিসারের দুর্গ-প্রাকার। দূরে ঐ যে অন্ধকার পাহাড়, বুদ্ধদেবের উপদেশ সংগ্রহ করবার জন্যে ওখানে শ্রমণদের মস্তবড় একটা সভা বসেছিল—

আলোয় মেয়েটির যে মুখখানা দেখেছিলাম, অন্ধকারে আর তা দেখতে পাচ্ছি না। শিক্ষায়, রুচিতে এবং স্বাভাবিকতায় এমন পরিপূর্ণ কে এই মেয়েটি? কে আশা করেছিল অজ্ঞাত অনাত্মীয় বিদেশে এমন একটি স্বজনের সঙ্গে এইরকম আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যাবে? কে এই নিরু—এবং কী এ?

পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম কুণ্ডে। বাঁধানো উঠোনে অশ্রান্ত প্রবাহে পঞ্চধারার জল আছড়ে পড়ছে। এত রাত্রে স্নাতক বেশী নেই, শুধু মর্মরশুভ্র কতকগুলি ভাস্করমূর্তির মতো দু-তিনটি তিব্বতী মেয়ে সর্বাঙ্গ খুলে ধারায় স্নান করছে। আমরাও ধারার জলে প্রথম পুণ্য সঞ্চয় করে সিঁড়ি দিয়ে নামলাম ব্রহ্মকুণ্ডে।

মাথার ওপরে শুধু বড় একটা আলো জ্বলছে, তার নীচে টলমল করছে কুণ্ডের উত্তপ্ত নীলজল। জলে নামতেই তাপে শরীরটা শিউরে উঠল, তারপর যখন কুণ্ডের জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসলাম, মনে হ'ল এমন চমৎকার ভালো লাগার অনুভূতি আমার জীবনে আর কখনো আসেনি।

অনু উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, বাঃ, কী ভালো লাগছে।

মাথার ওপরকার আলোতে নিরুর চোখদুটো কি এক মুহূর্তের

জন্যে চকচক করে উঠল ? না, আমার দেখবার ভুল ? নিরু বললে, শুধু ভালো লাগা নয়। এর জলে স্নান করলে সমস্ত ব্যাধি দূর হয়ে যায়, জানেন তো ? শরীরের ব্যাধি নয়, মনেরও।

অমু বললে, তাই বুঝি আপনি এখানে নিয়মিত স্নান করেন ?

—করি বৈকি। মনের ব্যাধির কি আর অন্ত আছে। আমরা তো আপনাদের মতো ভালো লোক নই।

অমু হেসে বললে, আমরাও ভালো লোক নই।

নিরু এক মুহূর্তের জন্যে চুপ করে রইল। তারপর বিষণ্ণভাবে হাসলে, বললে, উঠুন, রাত হয়ে গেছে।

অন্ধকার নির্জন পথ দিয়ে আবার আমরা ফিরে এলাম। কিন্তু নিরু এবার আর বেশী কথা বললে না, কেমন চিন্তিত আর অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। শুধু চলার তালে তালে তার ভিজে শাড়ীটা ছলাৎ ছলাৎ করে বাজতে লাগল।

বাড়িতে ফিরে দেখা গেল, নিরুর মা এর মধ্যেই আমাদের জন্যে চমৎকার মুগের ডালের খিচুড়ি আর দু তিনটে ভাজার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সমস্ত দিন ক্লান্তির পর কুণ্ডের স্নান যেন পেটে খিদের একেবারে ধূ ধূ আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কী অসম্ভব তৃপ্তির সঙ্গে যে খেলাম তা বলবার নয়।

ঘুমে শরীর একেবারে অচেতন হয়ে এসেছে। টলতে টলতে বিছানায় এসে পড়লাম। বাইরে থেকে পাহাড়ের হাওয়া যেন গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কোথায় গেল অপরিচিত জায়গার একটা আশ্চর্য রহস্য, কোথায় রইল নিরু, তন্দ্রার অতলে আমি তলিয়ে গেলাম। অমু যে কখন পাশে এসে শুয়েছে টেরও পাইনি।

পরদিন ঘুম ভাঙল নিরুর ডাকে।

বাইরে তখনো রাত্রি পুঞ্জিত হয়ে আছে। জানালার ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস। নিরু বললে, আপনাদের ট্রেনের কিন্তু আর দেরি নেই। আমার চায়ের জল ফুটে গেছে।

তটস্থ হয়ে আমরা উঠে পড়লাম।

নিরু বললে, রাতারাতি এলেন, অন্ধকার থাকতেই চলে যাচ্ছেন। রাজগীর একবার দেখে নিতেও পারলেন না। একটা দিন থেকে গেলেই তো পারেন।

—অসম্ভব। ছুটি ফুরিয়ে গেছে। আজ রাত্রেই দিল্লী এক্সপ্রেসে আমাদের কলকাতা ফিরতে হবে।

—আবার আসবেন তো?

—আসব বৈকি। আশা করি, আপনার আতিথ্যই পাওয়া যাবে।

—বড়লোককে আতিথ্য দেওয়াই কি আমার পেশা?—নিরুর গলার স্বর আকস্মিকভাবে অত্যন্ত রূঢ় ঠেকল: কামনা করবেন আমার সঙ্গে যেন আপনাদের আর কখনো দেখা না হয়।

পরক্ষণেই সে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। আমি সবিস্ময়ে বললাম, ব্যাপার কী?

মেঘের মতো মুখ করে অমু জবাব দিলে, জানি না।

—কাল তো খুব গল্প করলে দুজনে।

—ছাই—যেন একটা ধমক দিয়েই অমু মাঝপথে কথাটাকে থামিয়ে দিলে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চা নিয়ে এল নিরু। তার সঙ্গে লুচি,

হালুয়া। কত রাতে উঠে সে আমাদের জন্যে বসে বসে খাবার তৈরী করেছে কে জানে!

আশ্চর্য, নিরু বদলে গিয়েছে এর মধ্যেই। তেমনি প্রসন্ন স্নেহভরে হাসল। বললে, চা ঠাণ্ডা করবেন না বৌদি। পেট ভরে যা পারেন এই খেয়ে নিন, সারাদিন যে আর বিশেষ কিছু জুটবে তাতো মনে হয় না। আর এদিকে আজকাল কলেরা সুরু হচ্ছে, বাজারের পুরীটুরী কিছু খাবেন না কিন্তু।

চা খাওয়া নীরবেই শেষ হল। কারো মুখে কোনো কথা জোগাচ্ছে না। নিরু বললে, স্টেশনের পথ তো চেনেন না, চলুন, এগিয়ে দিয়ে আসি।

—আপনার মার সঙ্গে একবার দেখা করে—

—কিচ্ছু দরকার নেই। ঘুমুচ্ছেন।

ট্রেন যখন ছাড়ল তখন রাজগীরের পাহাড়ের ওপর প্রথম ভোরের আভাস দেখা দিয়েছে। সূর্য ওঠেনি, শুধু নিঃসঙ্গ রাত্রির তমসা ফিকে হয়ে যাচ্ছে। প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা নিরুর মূর্তিটা ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল—রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ-দেখা রহস্যময়ী রাত্রি ভোর হওয়ার আগেই মিলিয়ে গেল দৃষ্টির বাইরে।

আমি আর অনু দুজনেই চুপ করে বসেছিলাম। পেছনে পঞ্চগিরি ক্রমশ দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছিল—অড়োর ক্ষেতের ওপর এসে পড়ছিল সকালের সোনার আলো। নিরুর কথাই ভাবছিলাম। কে এই মেয়েটি—কী এ? নিজের সম্বন্ধে একটি কথাও বলেনি, শুধু আমাদের সব কথাগুলোই শুনে গেছে। অযাচিত ভাবে আশ্রয় দিয়েছে, যত্ন করেছে, অথচ নিজের সম্বন্ধে এতটুকুও দাবী নেই, তাকে যে কেউ মনে রাখবে তাও সে চায় না। আসবার

সময় তাই একটি কৃতজ্ঞতার কথা পর্যন্ত মনে আসেনি, একটা ধন্যবাদ জানাতে পারিনি পর্যন্ত।

বাস্তবিক—অদ্ভুত রহস্য একটা। যেন একটা রাত স্বপ্ন দেখলাম। তিমিরাবগুণ্ঠিত রাজগীরের সঙ্গে সঙ্গেই নিরুও তিমিরেই নিহিত হয়ে রইল, তার আভাস পেলাম, কিন্তু চিনতে পারলাম না।

অনু কী ভাবছিল, কে জানে। ওর চোখদুটো জলছে, যেন হিংস্র একটা বিদ্বেষে জলছে। হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফেরালো। বললে, কী ভাবছ?

—ভাবছিলাম—

—বুঝতে পেরেছি।—অনু থামিয়ে দিলে আমাকে; তা ছাড়া আর ভাববে কী। আর একটা দিন রাখতে পারলেই বেশ ফাঁদে ফেলতে পারত।

—তার মানে?—আহত পশুর মতো আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।

—মানে?—বিকৃত মুখে অনু বললে, মানে কী বোঝো না? বিয়ে হয়েছে বললে, অথচ কপালে সিঁদুর নেই, হাতে শাঁখা নেই কেন? ওর মা—সেই বিচ্ছিরি বুড়িটা রাত্তিরে কপকপ করে কতগুলো খিচুড়ি গিললে, কোনো বিধবা রাত্তিরে অমন করে খায় কখনো? তাছাড়া অজানা অচেনা লোককে স্টেসন থেকে ডেকে আনে, বাড়িতে আশ্রয় দেয়, অথচ কোনো পুরুষ অভিভাবক নেই— বুঝতে পারছ না?

বুঝতে পারছি বৈকি। সত্যিই তো—এসব কথা কেন এতক্ষণ আমার মনে হয়নি। চকিতে সব রহস্যের সমাধান হয়ে

গেছে। মনের ভেতরে যে কৃতজ্ঞতার ঋণ স্তূপাকার হয়ে জমে উঠেছিল, তাকে ঝেড়ে ফেলে দিতেও এক মুহূর্ত সময় লাগে না।

আমি সাগ্রহে বললাম, নিশ্চয়ই তাই। কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে হলে অমন পারে কখনো? নিশ্চয়ই একটা—এমন কুশ্রী মন্তব্য দিয়ে কথাটা শেষ করলাম যা আমার মতো ভদ্রলোকের পক্ষেই স্বাভাবিক।

আমার ভদ্রতার বিচারে ভদ্রলোকের মেয়ে নিশ্চয়ই নয় নিরু। আর সেইখানেই সমস্ত রহস্যের সমাপ্তি, কৃতজ্ঞতার অবসান। বরং বহু ভাগ্য যে আমাকে ফাঁদে ফেলতে পারেনি।

একটা পরম নিশ্চিন্ততা ও সুগভীর আরামে মনটা ভরে গেল। সামনের বেঞ্চিতে পা তুলে দিয়ে আরাম করে সিগারেট ধরালাম।

ততক্ষণে উজ্জ্বল সূর্যালোকে পৃথিবী প্লাবিত হয়ে গেছে—দিগন্তে মিলিয়ে গেছে পঞ্চগিরির পাণ্ডুর আভাস আর নিশীথের স্বপ্ন বিলাস।

জন্মান্তর

একটা পা কাটা বলেই ধরা পড়ল, নইলে পড়ত না।

হাতের কাজ হয়েছিল নিখুঁত। পাখীর পালকের চাইতেও নরম আর আলগা ছোঁয়ায় পকেট থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়েছিল। ট্রামের দরজার সামনে যা ভিড় হয়েছে এবং যেভাবে মানুষ পাগলের মতো ওঠবার চেষ্টা করছে তার ভেতরে কেউ যে ঘুণাক্ষরে টের পেতে পারে এমন আশঙ্কাও মনে জাগেনি। বিকেল সাড়ে ছটার সময় ডালহাউসি ফেরত ট্রামের মতো শিকারের এমন অপূর্ব জায়গা আর কী আছে!

আর মাত্র একটা স্টপ এগোতে পারলেই সে নেমে পড়তে পারত। মুহূর্তে মিলিয়ে যেতে পারত যুদ্ধরত কলকাতার উন্মত্ত উদ্দাম জনারণ্যের মধ্যে। তার পরে লালাজীর মদের দোকান। তিন-চার বোতলের দাম বাকী পড়েছে, আজকেই মিটিয়ে দিয়ে প্রাণ ভরে খেয়ে নিতে পারত। আস্তে আস্তে স্তিমিত-দীপ কলকাতার ওপর দিয়ে পিঙ্গল রাত্রি আসত ঘনিয়ে; ডাস্টবিন, ডিমের খোলা আর কাঁচা নর্দমার পেঁকো গন্ধ-ভরা গলিতে অব-গুণ্ঠিত একটি গ্যাস্‌পোস্টের নীচে বসন্তের দাগ লাগা মুখের ওপর সস্তা পাউডারের প্রলেপ লাগিয়ে যেখানে মেহেরজান দাঁড়িয়ে আছে খরিদ্দারের আশায়—টলতে টলতে সেখানে গিয়েও পৌঁছুতে পারত। একটি রাত্রি কেটে যেত—আকাশ বাতাস পৃথিবীর আকার অবয়বহীন পিণ্ডাকার একটি কবোষ্ণ রাত্রি!

যে কল্পনাটা মনের মধ্যে নীহারিকার মতো ঘুরছিল, পরিপূর্ণ একটা রূপ পাওয়ার আগেই আচমকা খানিকটা ঝড়ো হাওয়ায় সেটা দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

ট্রাম ছুটছিল পুরো দমে। অভ্যস্ত ডান হাতটা পাখীর পালকের মতো নরম আলগা ছোঁয়ায় পকেট থেকে স্ফীতকায় ব্যাগটা তুলে নিয়েছিল। কিন্তু লেডিজ সীটের পাশে কোণার ছোট জায়গাটিতে যে ছোকরা বাবুটি মন দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল সে হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

—নিলে, নিলে—পকেটমার—

—কে, কে, কই? প্রচণ্ড হট্টগোল। ট্রামের দড়িতে টান পড়ল, ঘচাং করে থেমে গেল গাড়িটা।

তখন আর উপায় ছিল না। বিদ্যুৎবেগে সেই অবস্থাতেই নীচে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু সেই সঙ্গেই তার ঘাড়ের ওপরেও ঝাঁপিয়ে পড়ল আরো পাঁচ-সাত জন। হাতে হাতে ধরা পড়ল বুলাকীরাম।

ব্যাগের মালিক ছোঁ দিয়ে ব্যাগটা তুলে নিলেন। আধ-বয়সী প্রৌঢ় লোক, গলাবন্ধ কোটের সঙ্গে জড়ানো সিল্কের চাদর। ইয়োরোপীয়ান ফার্মের বড়বাবু।

আশঙ্কায় ভদ্রলোকের মুখ নীল হয়ে গেছে।—কী সর্বনাশ, এখুনি পাঁচশো টাকায় ঘা দিয়েছিল শালা।

—দেখুন, দেখুন—সব ঠিক আছে কিনা।

ত্রস্ত-হাতে ব্যাগ খুলে নোটের তাড়াটা দেখে নিলেন ভদ্রলোক।

বুলাকী কী বলবার চেষ্টা করলে কিন্তু বলতে পারলে না।

চার দিক থেকে নির্বিচারে কিল-ঘুষি আসছে বন্যার মতো। নিস্সাড় নির্বাক্ হয়ে প'ড়ে রইল বুলাকী। এর পরে থানায় যেতে হবে। নাক থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত রাস্তার ধূলোর ওপরে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

কিন্তু ভদ্রলোক দয়ালু।

—ছেড়ে দিন মশাই, ছেড়ে দিন। ব্যাগ তো পাওয়াই গেছে, এখন আর—

ঘণ্টা বাজিয়ে ডালহাউসি স্কোয়ারের ট্রাম শ্যামবাজারে চলে গেল।

বুলাকী অবশ্য বেশীক্ষণ পড়ে রইল না পথের ধারে। কাঠের পা-টায় ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। চড়ের জ্বালায় গাল দু'টো চিনচিন করছে। মুখের ভেতরে একটা কেমন নোন্‌তা নোন্‌তা স্বাদ, দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ছে নিশ্চয়। নাকের রক্তে বুকের জামাটায় তিন-চারটে বড় বড় ছোপ পড়েছে।

—শা—লা—

বিকৃত মুখে বিড়ির জন্যে পকেটে হাত দিলে বুলাকী। বিড়ি নেই। ব্যাগের সন্ধান করতে গিয়ে ভদ্রবাবুরা বিড়িগুলো সব ছড়িয়ে দিয়েছে পথের ওপর—ধুলোয় বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট দুঃখের কারণ নয় বুলাকীর। মেহেরজানের জন্যে এক শিশি সৌখীন আতর যে কিনেছিল ওই সঙ্গে সেই শিশিটাও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে একেবারে।

দিগন্তে বিলীয়মান ট্রামটার দিকে একবার আগুন-ঝরা চোখ মেলে তাকালো বুলাকী। আবার বললে, শা—লা।

আশ-পাশের ভিড়টা সম্পূর্ণ কাটেনি এখনো। চারদিক থেকে নানা রকমের মন্তব্য কানে আসছে।

—অতি বদমায়েস এই ব্যাটারা মশায়। সেদিন পকেট থেকে আমার শেফার্স কলমটা দিব্যি তুলে নিয়ে গেল।—পুলিশে দেওয়া উচিত ছিল হারামজাদাকে।

হারামজাদা। বুলাকীর রক্ত গর্জে উঠল ফণা-তোলা সাপের মতো। সঙ্গে যদি একখানা ছোরা থাকত আর অবকাশটা যদি অনুকূল হত তাহলে এর জবাব দিতে পারত বুলাকী। কিন্তু সে সময় নয়, সে সুযোগও নেই। মেছোবাজারের সঙ্কীর্ণ গলির পথে এখনো সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসেনি। এখানে কলকাতার বড় রাস্তার ওপরে এখনো দিনের ঝকঝকে আলো ঝলকাচ্ছে; এখানে ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে ট্রাম, ছুটে চলেছে বাস, রিক্সা, ট্যাক্সী আর মিলিটারী কন্‌ভয়ের সারি।

পকেটের ফুল-কাটা সৌখীন রুমালে নাক-মুখ মুছে নিলে বুলাকী। আড়ষ্ট পায়ে একটু একটু করে এগোতে লাগল। মাথাটা ঘুরছে, কিল-চড়গুলো কিছুমাত্র দয়া করেনি। কোথাও একটু বসা দরকার। একটু চা খেতে পেলেও ভালো হত।

বেলা ডুবে আসছে। কলকাতার বুকে সন্ধ্যা। ঠোঙ্গাপরা আলোগুলো জ্বলে উঠছে একটার পর একটা। হেদুয়ার গাছগুলোতে কাকেরা কোলাহল করছে। পার্কে জনতা। ওখানে বসা চলবে না। একটু নিরিবিলি দরকার—একটু নির্জনতা।

হারামজাদা। কানের ভেতরে তখনো কথাটা যেন সূচের মতো বিঁধছে। বুলাকীর রক্ত ফেনিয়ে উঠতে লাগল। মেছো-বাজারের দুর্গন্ধ গলিতে যদি ঘনিয়ে আসত ধোঁয়াটে অন্ধকার;

যদি বুলাকীর কাছে একখানা ছোরা থাকত ; যদি ওই ভদ্রবাবুদের এক-এক জন করে সে পেত—

—শা—লা—

সাপের গর্জনের মতো চাপা আক্রোশটা আবার বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

কিন্তু আর হাঁটতে পারছে না। কাঠের পা-টা অত্যন্ত বেশী ভারী বলে মনে হচ্ছে। এ পায়েরও জোড়গুলো যেন আলগা হয়ে গেছে সব। আর এত দুঃখের মধ্যেও ভাঙা আতরের শিশিটা থেকে একটা উগ্র গন্ধ যেন তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। যেন ঠাট্টা করছে বুলাকীকে।

মেহেরজান। চিৎপুরের গলি। ল্যাম্প-পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে আছে জাফরান-রঙ একখানা শাড়ী পরে। রঙিন কাঁচুলির বাহার প্রলোভন জাগিয়ে উঁকি দিচ্ছে পাতলা শাড়ির আড়াল থেকে। আবছা আলোয় ভরা মেহেরজানের ঘর। মেজেতে নরম বিছানা পাতা—একরাশ ছোট বড় বালিশ।

কিন্তু—না। অনেক দিন কিছু দেওয়া হয়নি বেচারীকে। ওরও বড় কষ্ট। বয়েস হয়ে গেছে—সস্তা পাউডার মেখেও মুখের দাগগুলো ঢাকা পড়ে না, খরিদ্দার দেশলাই জ্বালিয়েই অন্য দিকে এগিয়ে যায়। আক্রার বাজার, কায়ক্লেশে দিন চলে। তবু বুলাকীকে কখনো বিমুখ করে না মেহেরজান। ভালোবাসে ? কে জানে, কিন্তু ভয় করে বৈকি। বাঘের মতো হিংস্র বুলাকী, সাপের মতো ভয়ঙ্কর। একখানা পা নাই বটে, কিন্তু ছোরা চলে নিখুঁত এবং নির্ভুল ভাবে। তাই হয়তো বিনা প্রতিবাদেই আত্মসমর্পণ করে, সোহাগের কথা বলে, নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ায়।

কিন্তু বুলাকীরও তো একটা ধর্মভয় আছে। সত্যি বড় কষ্ট মেহেরজানের। শাড়ী ছিঁড়ে গেছে। পেট ভরে খেতে পায় না যুদ্ধের বাজারে। কুৎসিত মুখ দিনের পর দিন আরো কদর্য হয়ে যাচ্ছে। এ সময়ে যদি বুলাকী ওকে কিছু দিতে পারত,—অন্তত একখানা শাড়ী দিয়েও—

পাখীর পালকের মতো নরম আলগা ছোঁয়ায় ব্যাগটা চমৎকার হাতের ভেতরে চলে এসেছিল। বেশ পুরু ব্যাগটা—পাঁচশো টাকা ছিল। উঃ—পাঁচশো টাকা। ভাবতেও গায়ের লোমগুলো শির শির করে উঠল। ওই টাকায় কী হতে পারত এবং কী হতে পারত না। ইস্—হাতের মধ্যে এসেও ফস্কে গেল, শুধু একটুর জন্তে।

—হারামজাদা—

কিন্তু আর চলতে পারছে না। মাথা ঘুরছে। বুলাকী আবার পার্কটার দিকে তাকালো। বড় ভিড় ওখানে, ভদ্রলোকের ভিড়। একটু নির্জনতা দরকার বুলাকীর—একটু নিরিবিলি।

—এ রিক্স—

ঠুন ঠুন করে রিক্সওয়ালা এল।

—কাঁহা যাইয়েগা ?

—রথতলা ঘাট, গঙ্গা।

—আট আনা লাগেগা।—একবার বুলাকীর সর্বাঙ্গে সংশয়ভরা দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে রিক্সওয়ালা।

— চলো ভাই চলো। সব ঠিক হো যায়গা।

ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্। রিক্স চলছে। বীডন স্ট্রীট—ঠোঙ্গাপরা আলো, স্বচ্ছ অন্ধকার। হেমন্তের কুয়াশা আর উনুনের ধোঁয়া

আকাশে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। সেণ্ট্রাল এভিনিউ। ওখান দিয়ে একটু এগিয়ে মস্‌জিদ্‌বাড়িতে ঢুকলেই—

সেই গলি। গ্যাস-পোস্ট। জাফরান-রঙা শাড়ীপরা মেহেরজান। ঘরের মেঝেতে নরম গদী আর তাকিয়া। হাতের মুঠোর মধ্যে পাঁচশো টাকা কেমন অবলীলাক্রমে চলে এসেছিল। উঃ—ভদ্রলোক—ওই ভদ্রলোকদের একবার হাতে পেলে দেখে নেবে বুলাকী। ছোরার মুখে একটা তাজা কলিজাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিতে কতক্ষণ লাগে!

ঠন্‌ ঠন্‌ ঠন্‌। চিৎপুর দিয়ে রিক্‌স চলেছে। পথের দু'দিকের রোয়াকে চোখে পড়ছে আরো অনেক মেহেরজানকে। ওদের প্রায় সকলকেই চেনে বুলাকী, বুলাকীকেও ওরা চেনে। কিন্তু সবাই মেহেরজান নয়। খালি-পকেট প্রেমিককে ভালোবাসা বিলোতে রাজী নয় ওরা—ওদেরও বুলাকীরা আছে।

—উতারিয়ে—

স্ট্র্যাণ্ড্‌ রোডের রেল-লাইন পেরিয়ে রিক্‌স চলে এসেছে রথতলা ঘাটে। সামনে অন্ধকার গঙ্গা। দূরে একটা মাল্‌গাড়ির এঞ্জিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অকারণে হুশ হুশ করছে।

—উতারো ভাই, গঙ্গাজী আ গিয়া—

—ঠারো বাপ্‌ ঠারো। খোঁড়া আদ্‌মি—

কাঠের পা-টা আগে বাড়িয়ে দিয়ে নামল বুলাকী। শরীরটা টাল খেলো একবার। একটুর জন্যে পড়েনি। ভদ্রলোকেরা শরীরে আর কিছু রাখেনি, মেরে একেবারে থেঁত্‌লা করে দিয়েছে।

কোমরের কষি থেকে সাবধানে বুলাকী খুঁজে বার করলে গেঁজেটা। আড়াই টাকার মতো সম্বল আছে এখনো। আট আনা পয়সা দিয়ে রিক্‌সওলাটাকে সে বিদায় করে দিলে।

সামনে হেমন্তের গঙ্গা। জোর হাওয়া দিচ্ছে—শীত শীত করতে লাগল। কিন্তু বুলাকীর ভালো লাগল, এই হাওয়াটা যেন তার দরকার ছিল। যেন এরই জন্তে এতক্ষণ প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা করে ছিল সে। মাথার ভেতর যে আগুনটা জ্বলছিল, গঙ্গার বাতাসে তার অনেকটাই যেন নিবে এল।

চার দিক্‌টা প্রায় নির্জন। একে অন্ধকার, তার ওপরে শীতের বাতাস। শুধু গঙ্গার ঘাটে দু'-একজন লোক বসে আছে, ভালো করে তাদের বোঝা যাচ্ছে না, কয়েকটা ছায়া-মূর্তি বলে মনে হচ্ছে। এদিকে বিস্তীর্ণ পোস্তাটা সম্পূর্ণ নির্জন হয়ে আছে—এই শীতের সন্ধ্যায় ওখানে বসে হাওয়া খাওয়ার সখ নেই কারো।

সিঁড়ি দিয়ে বুলাকী নীচে নেমে এল। গঙ্গায় ভরা জোয়ারের টান, জল অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে, ছল ছল করে ইটের গায়ে বাজিয়ে চলেছে মিষ্টি জল-তরঙ্গ। ওপারে হাওড়ার আলো, দু'-তিনটে বড় বড় কলের চোঙার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মাঝ গাঙে দু'টো নারকোলের জাহাজ নোঙর করে আছে, অন্ধকার স্রোতের ওপরে লাল-সবুজ আলোর দীর্ঘায়িত রেশ নাচানাচি করছে।

হাত দু'টো জলে ডুবিয়ে দিতেই একটা স্নিগ্ধ ভালোবাসার স্পর্শে যেন বুলাকীর সমস্ত শরীরের ভেতরটা আনন্দিত হয়ে উঠল। আঁজলা আঁজলা করে সে ঘোলা গঙ্গাজল খেল, মাথা-মুখ সমস্ত ধুয়ে নিল। অর্ধেক গ্লানি যেন তার কেটে গেছে। গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাসে আশ্চর্য একটা ঘুম-পাড়ানি। আঃ—

কী অসম্ভব ভালো লাগছে। কোনোখানে আর এতটুকু যন্ত্রণা নেই— যেন ঘুমিয়ে পড়বে এক্ষুনি। একটা বিড়ি পেলে কাজ দিত; কাছাকাছি চেনা দোকানও আছে, কিন্তু বুলাকীর উঠতে

ইচ্ছে করল না আর। সিঁড়ির পেছন দিকে পোস্তার দেওয়াল ঘেঁষে বুলাকী লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

বাতাসে আতর উড়ছে। গন্ধটা শুধু বুলাকীর নাকে নয়, মুখের ভেতরেও ঢুকছে, যেন জিভটাকেও মিষ্টি করে তুলছে। স্বপ্নের মতো মনে পড়তে লাগল—মেহেরজান, ডালহাউসি স্কোয়ার থেকে শ্যাম-বাজারের ফিরতি ট্রাম, সেই পাঁচশো টাকার নোটে ভর্তি মোটা ব্যাগটা, তারপর—

তারপর বুলাকী ঘুমিয়ে পড়ল। নির্জন গঙ্গার ওপর ঘন হতে লাগল রাত্রি, ওপারে হাওড়ার আলোগুলো কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির অতলে মিলিয়ে যেতে লাগল একে একে।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিল।

নেশায় বেহুঁশ হয়ে সে মেহেরজানের দোর-গোড়ায় এসে পড়েছে। মেহেরজান করেছে কী, কোথা থেকে এক বালতি ঠাণ্ডা জল এনে ওর মাথায় ঢেলে দিয়েছে আর তার সঙ্গে জোর পাখার হাওয়া। শীতে নেশা ছুটে গেছে, ধড়ফড় করে উঠে বসেছে সে। সত্যিই ধড়ফড় করে উঠে বসল সে। অন্ধকার পোস্তা, অন্ধকার গঙ্গা। রাত কত হয়েছে কে জানে। আকাশে অল্প অল্প মেঘ করছে, তারা ডুবে গেছে আর গঙ্গা থেকে উঠে আসছে জোর জলো হাওয়া। নেশা করেনি বুলাকী, মেহেরজানও নয়, শুধু মারের জ্বালায় একটা অবসন্ন নিরুপায় শরীর নিয়ে সে রথতলা ঘাটের পোস্তায় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

উঠতে যাবে এমন সময় চমক ভেঙে গেল।

চারদিকে ঘন অন্ধকার—তবু বুলাকীর অভ্যস্ত চোখ দেখতে পেল শাদা মত কে একজন সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে গঙ্গার দিকে

নেমে যাচ্ছে। সিঁড়ির পাশে ছায়ার মধ্যে বুলাকী তলিয়ে আছে, সুতরাং তাকে সে দেখতে পায়নি। রোমাঞ্চিত হয়ে বুলাকী শুনতে পেল সেই মূর্তিটা কাঁদছে। চাপা গলায় আকুল হয়ে কাঁদছে একটি মেয়ে। দ্বিধামন্থর শঙ্কিত পায়ে সে ক্রমেই এগিয়ে চলেছে—এগিয়ে চলেছে গঙ্গার দিকে।

সর্বনাশ!

একটা সম্ভাবনার কথা মনের ভেতর উঁকি দিয়েই বুলাকীর স্নায়ুগুলো দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে গেল। মেয়েটা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে না তো? এই নিশীথরাত্রে নিরিবিলি গঙ্গার ঘাটে অমন ভাবে একটি নিঃসঙ্গ মেয়ে গঙ্গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কেন? এর অর্থ কী হতে পারে?

খট্ করে কাঠের পা-টা টেনে বুলাকী উঠে পড়ল। বললে, কে?

মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কে?

তবু জবাব নেই। যেন একটা পাথরের মূর্তি। বুলাকীর মনে হল মেয়েটা থর থর করে কাঁপছে।

বুলাকী এগিয়ে এসে গঙ্গা আড়াল করে মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কে তুমি? কী করছ এখানে?

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত একটা কান্নার জোয়ার। প্রবল কোঁপানির সঙ্গে আকুল মিনতি শোনা গেল: ছেড়ে দাও আমাকে। দোহাই তোমার, আমাকে পুলিশে দিয়ো না।

বুলাকী সস্নেহে হাসল। আকস্মিক একটা করুণায় মনটা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। শুধু খুন নয়, শুধু গুণ্ডামি নয়, শুধু মাস্তানি

নয়। আজ রাত্রে আশ্চর্য ভাবে একটা কিছু ভালো করবার সুযোগ পেয়েছে বুলাকী। একটা কিছু মহত্তর—একটা এমন কিছু যা সে জীবনে কখনো করেনি, যা করবার অবকাশ তার কোনো দিন ঘটেনি। বিচিত্র উত্তেজনায় রক্তে দোলা লেগে গেল বুলাকীর—এই মুহূর্তে যেন সে নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে।

—না, না, কোনো ভয় নেই মা। আমি পুলিশ নই।

পকেটে বিড়ি নেই, দেশালাইটা আছে। খস্ করে সেইটেই জ্বালালো বুলাকী। ভীতি-বিহ্বল একটা পাণ্ডুর মুখ চকিতে দেশালাইয়ের আলোয় আভাসিত হয়ে উঠল। কুড়ি-বাইশ বছরের একটি ভদ্রলোকের মেয়ে। গায়ে গয়নার দীপ্তি। শাদা কাপড়ে জড়ানো একটা পুঁটলি বুকের ভেতরে আঁকড়ে ধরে আছে। গলায় সোনার হার, ভারী লকেটটা থেকে পলকের জন্যে বুলাকীর চোখে একটা ঝিলিক জাগিয়ে কাঠিটা নিবে গেল। নিজের অজ্ঞাতেই বুলাকীর মন বলে উঠল: মেহেরজান, অনেক টাকা দরকার, নির্জন গঙ্গার ঘাটে একটি নিঃসঙ্গ মেয়ের এক-গা গয়না, দুখানা লোহার মতো হাতের মুঠি বাড়িয়ে দিলেই—

কিন্তু না—না। আজ একটা দুর্লভ মুহূর্ত পেয়েছে বুলাকী। দুর্লভ মুহূর্ত—বুলাকীর জীবনে ভালো হওয়ার, ভাল করবার। আজ সে লোভ নিয়ে আসেনি, স্বার্থ নিয়েও আসেনি। এই মেয়েটিকে সে বাঁচাবে—রক্ষা করবে একটা অমূল্য জীবন।

বুলাকী জিজ্ঞাসা করলে, তোমার সঙ্গে ওটা কিসের পুঁটলি মা?

গলার স্বরে মেয়েটি বোধ হয় ভরসা পেয়েছে। দেশালাইয়ের আলোয় আরো দেখতে পেয়েছে যে বুলাকী পুলিশ নয়। সন্ত্রস্ত শঙ্কিত স্বরে জবাব দিলে, আমার—আমার ছেলে।

—একেবারে কচি ছেলে। ওকে নিয়েই ডুবে মরতে যাচ্ছিলে?

অন্ধকারের ভেতরে মেয়েটি যেন শিউরে উঠল, জবাব দিলে না।

বুলাকী বলে, ছিঃ মা, ডুবে মরবে কেন? এর চেয়ে কী আর পাপ আছে? গঙ্গাজীতে ডুবলেও নিস্তার নেই, জিন-পেত্নী হয়ে থাকতে হবে। রামচন্দ্রজী যে জান দিয়েছেন সে কি নষ্ট করবার জন্যে?

কথাটা বলে নিজের মধ্যেই কৌতুক বোধ করলে বুলাকী। সে ধর্ম-কথা বলছে, উপদেশ শোনাচ্ছে। বুলাকীরাম, জীবনে এমন বজ্জাতি নেই যা সে করেনি। আজ গঙ্গার ধারে পরম বিস্ময়কর এই মুহূর্তটিতে তার জন্মান্তর হয়ে গেল না কি! দলের লোকেরা এ কথা শুনলে তাকে বলবে কী!

বুলাকী বললে, শোনো মা, আমিও তোমার ছেলে। আমার কাছে লজ্জা কোরো না। কী দুঃখ তোমার? তোমার স্বামী মাতাল, তোমাকে খুব কষ্ট দেয়, তাই না?

বিহ্বল গলায় মেয়েটি জবাব দিলে, হুঁ।

বুলাকী হেসে উঠল, হেসে উঠল পরম পরিতৃপ্ত ভাবে। আজ তার জন্মান্তর। শুধু অবিচ্ছিন্ন ভাবে অন্যায়ই নয়, সে ভালো করতে পারে। শুধু দুঃখ দিতে পারে তাই নয়, দুঃখ মোচনও করতে পারে।

—এই দুঃখে তুমি মরে যেতে চাও? ছিঃ ছিঃ। আমার নাম জেনে রাখো মা, আমি বুলাকীরাম, আমি মুর্গীহাটার নামদার গুণ্ডা। এক কথায় আমি মানুষ খুন করতে পারি।

অন্ধকারের ভেতরে মেয়েটির অস্ফুট আর্তনাদ শোনা গেল।

মিষ্টি করে হাসতে গিয়েও বুলাকী তীব্র কর্কশ গলায়

হেসে ফেলল : না, মা, তোমার কোনো ভয় নেই। আমি তোমাকে মা বলেছি। তোমার স্বামীর নাম আমাকে বলো, এমন ভাবে শাসিয়ে দেব যে কখনো তোমার গায়ে হাত তুলতে ভরসা পাবে না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি।

শীতের হাওয়ায় মেয়েটি কাঁপছে, থর থর করে কাঁপছে। গঙ্গার জলে ঢেউয়ের কলধ্বনি। পোস্তার ওপরে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন অন্ধকার গাছের ডালে-পাতায় বাতাস শোঁ শোঁ করছে। ভীত অস্পষ্ট আওয়াজ এল : থাক।

—ওঃ, ভয় করছে? আমি গুণ্ডা—হাতের ঠিক নেই, তোমার স্বামীকে হয়তো মেরে বসতে পারি—তাই না?—বুলাকী এক সারি শাদা দাঁত বার করে বললে, স্বামীর জন্যে এত দরদ, আর তার জন্যেই ডুবে মরতে যাচ্ছিলে মা? মেয়েমানুষ এম্‌নি তাজ্জব জানোয়ারই বটে।—নিজের রসিকতায় ঝামা-ঘষার মতো শব্দ করে সে হাসতে লাগল।

মেয়েটি জবাব দিলে না।

—আচ্ছা যাক, মায়ের যখন অত ভয়, তখন বাবাকে আমি এ যাত্রা কিছু আর বলবো না। কিন্তু আমার ঠিকানাটা জেনে রাখো মা। যখনি বিপদে পড়বে, খবর দিয়ো। যদি জেলে না থাকি, যা পারি আমি করব। বুলাকী ঠিকানাটা বললে : মনে থাকবে তো? মনে থাকবে তো মা?

আশ্চর্য দরদ আর আন্তরিকতা বুলাকীর গলায়। নিজের যে মাকে কোন্ ছেলেবেলায় হারিয়েছিল, স্মৃতির ভেতরে বহুবার হাত্‌ড়েও যার মুখখানা বুলাকী কখনো মনেও করতে পারেনি,—নিশীথ রাত্রির মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে

আজ তাকেই সে ফিরে পেল নাকি! সামনে ভরা ভাঁটার বিশাল জলস্রোত কল্‌কল্‌ করে ছুটে চলেছে, দু'পাড়ে নিঃসাড় ঘুমের মধ্যে মূর্ছিত হয়ে আছে মহানগরী, আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে লঘু মেঘ বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের ভেতরে নিজের শরীরটাকে যেমন সে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না, তেম্‌নি নিজের মনটাকেও কি সে হারিয়ে ফেলল? সে—বুলাকীরাম!

তবু অদ্ভুত ভালো লাগছে—অপূর্ব একটা আনন্দে সমস্ত চৈতন্য পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তবু ভালো, আজ নেশা করেনি বুলাকী, নিজের শিরাগুলোকে জ্বালিয়ে রাখেনি দেশী মদের তরল আগুন দিয়ে। তা হলে কী হত কে জানে। দেশালাইয়ের আলোয় ওই সোনার লকেটটার ঝলক আভাসে তাকে সেই কথাই বলে দিয়েছে। নিঃশব্দে একটা নির্বিঘ্ন খুন করে হাওয়া হয়ে যেতে তার কতক্ষণ লাগত। সামনে গঙ্গার খরধারা ছিল, ভোর হওয়ার আগে হয়তো মড়াটা গিয়ে ডায়মণ্ড হারবারেই ভেসে উঠত।

না—না, নিজেকে বিশ্বাস নেই। আর দেশালাই জ্বালবে না। প্রশ্রয় দেবে না নিজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা শয়তানটাকে। এই রাত্রিটা বুলাকীর জীবনে ব্যতিক্রম। এমন মুহূর্ত কাল আর আসবে না, এমন রাত্রিও না। শুধু কাল কেন, কোনো দিনই হয়তো আসবে না। অনাগত রাতগুলোকে অভ্যস্ত নিয়মে পরিপূর্ণ করে রাখবে জুয়ার আড্ডা, মদের গেলাস, অনেক অনেক অকীর্তি, অনেক মারামারি আর সাপের মতো মেহেরজানের আলিঙ্গন। সেই সব সময়ে, সেই সব মত্ততার অবকাশে যখন

একটুখানি নিজের মধ্যে ফিরে আসবে বুলাকী, তখন হয়তো এই রাতটাকে মনে পড়বে, মনে পড়বে তার হঠাৎ পাওয়া ভালো করে না-দেখা মাকে, মনে পড়বে ক্ষিপ্রগতিতে বয়ে যাওয়া ধ্বনি-মুখরিত এই নিশীথ গঙ্গাকে, মনে পড়বে অকারণ হাসির মতো আঁধার ডাল-পালার শন্-শন্ শোঁ শোঁ শব্দটাকে—

বুলাকী যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। নেশা করেনি, তবু এ এক নতুন নেশা। ভালো হওয়ার নেশা, একটা বিচিত্র ব্যতিক্রমের রাতকে চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত করে নেবার নেশা।

স্নেহসিক্ত কোমল গলায় সে আবার বললে, মনে থাকবে মা, মনে থাকবে তো ?

মেয়েটি মাথা নাড়ল। দেখা গেল শীতে সে কাঁপছে, যেন আর দাঁড়াতে পারছে না।

—তাহলে ফিরে চলো। বাড়ি চলো।

মেয়েটি নড়ে না।

—চলো, ফিরে চলো।

মেয়েটি তবুও স্তব্ধ।

—ভয় করছে ? বেশ, আমি তোমায় এগিয়ে দিচ্ছি। আমি বুলাকীরাম—যতক্ষণ সঙ্গে আছি, কেউ তোমার গা ছুঁতে পারবে না। তোমাকে মা বলেছি, ছেলে থাকতে তোমার ভাবনা কী।

মেয়েটি দ্বিধা করছে। কেমন বিহ্বল বোধ করছে, কেমন বিচলিত হয়ে গেছে। ফিরে যেতে তার পা উঠছে না যেন। এবার যেন বুলাকী কেমন একটা নৈরাশ্য অনুভব করলে। এতক্ষণ ধরে কথা বলছে, এমন ভাবে আশ্বাস দিচ্ছে, তবু তার মা ভালো করে

সাড়া দিচ্ছে না, খুশি হয়ে উঠছে না, একটা পাথরে-গড়া প্রতিমূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে আছে।

আকস্মিক একটা তিক্ততা মনের ভেতর ঠেলে উঠেছিল, বলতে ইচ্ছে করল, তবে মরো গে যাও। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে বুলাকী। আজকের রাতটা সে নষ্ট করতে দেবে না, কিছুতেই এই অপূর্ব মুহূর্তটার সুর কাটতে দেবে না। বুলাকী আবার বললে, চলো, চলো।

—কিন্তু—একটা জড়িত স্বর।

—আর কিন্তু নেই—তোমাকে ফিরে যেতে হবে।—কেমন যেন জেদ চেপেছে বুলাকীর : চলো মা, চলো। তোমার বাড়িটা আমি দেখব। তুমি নিজে কিছু না বলো, তোমার দুঃখের প্রতীকার আমিই করব।

মড়ার মতো অসাড় পায়ে নিরুপায়ের মতো চলতে শুরু করলে মেয়েটি।

অন্ধকার স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে দু'জনে এগিয়ে চলল। কেউ কোনো কথা বলছে না। মেয়েটি কী ভাবছে কে জানে। কিন্তু মেয়েটির কথা শুধু বুলাকী ভাবছে না,—তার নিজের মধ্যেই সে তলিয়ে গেছে। কী আশ্চর্য একটা বিপুল অনুভূতি—যেন জন্মান্তর, বুলাকীর জন্মান্তর!

রেল-লাইনটা পেরিয়ে একটা গলির মুখে মেয়েটি থমকে দাঁড়াল্লো।

—কী মা, চলতে পাচ্ছ না? কষ্ট হচ্ছে? আচ্ছা, তোমার ছেলে আমার কোলে দাও।

দূরে একটা ল্যাম্প-পোস্টের অস্বচ্ছ আলো। তাতে দেখা গেল, মেয়েটি যেন শিউরে উঠল।

বুলাকী হাসল : ভয় নেই, ভয় নেই। গুণ্ডার হাত, কিন্তু ছেলে ধরতে পারব।

তেমনি জড়িত গলায় মেয়েটি বললে, ঘুমুচ্ছে।

—ঘুমুক, জাগাব না—বুলাকী হাত বাড়িয়ে সযত্নে পুঁটলিটা বুকের মধ্যে টেনে নিলে। কাপড়ের ভেতরে একটা নরম শিশু-দেহের আভাস পাওয়া গেল।

আবার মেয়েটির অস্পষ্ট স্বর : আমি আগে হাঁটতে পারছি না, ভয় করছে।

—বেশ, আমি আগে আগে যাচ্ছি—

বুলাকী চলতে সুরু করলে। গলির পর অন্ধকার গলি। পরম স্নেহে বুলাকী শিশুটিকে বুকের মধ্যে ধরে রেখেছে, একটু ব্যথা না লাগে, ঘুম না ভাঙে। মনের ভেতরে তেম্‌নি একটা অপূর্ব কৌতুক বোধ করছে সে। নামদার গুণ্ডা বুলাকীরাম ছেলে আগলে নিয়ে চলেছে,—অত্যন্ত যত্নে, অত্যন্ত সাবধানে। দলের লোকেরা যখন শুনবে—

না, না, কেউ শুনবে না। আজ রাত্রে বুলাকী সম্পূর্ণ আলাদা লোক। আজ তার একটি ব্যতিক্রমের মুহূর্ত। এ তার নিভৃত মনের মধ্যেই লুকোনো রইল।

অন্ধকার গলির মধ্যে কতক্ষণ চলেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ মুখের ওপর টর্চের ঝাঁঝালো আলো। কড়া গলায় ধমক এল : কোন্ হ্যায়?

সামনে এসে পড়েছে একটা সার্জেন্ট আর দু'জন কনেস্টবল।

—এই কেয়া হ্যায় তুমারা পাস?

—মাইজী কো লেড়কা।

—মাইজী ? মাইজী কাঁহা ?

চমকে বুলাকী পেছন ফিরল। মাইজী নেই, গঙ্গার ঘাটে পরম মুহূর্তে কুড়িয়ে পাওয়া তার মায়ের চিহ্ন নেই কোথাও। টর্চের আলোয় ঝলকে উঠেছে সরীসৃপের মতো অন্ধকার শূন্য গলিটা। বুলাকী নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।

—উতারো,—কেইসা মাইজীকা লেড়কা তুমারা !

বুলাকীকে কিছু করতে হল না, টর্চের আলোয় পাহারাওলারা কাপড়ের মোড়কটা খুলতেই চোখে পড়ল রক্তস্নাত একটি সদ্যো-জাত শিশু ! শুধু সদ্যোজাত নয়, তাকে গলা টিপে খুন করে ফেলা হয়েছে, যাতে জন্মের পর তার এতটুকু কান্নার শব্দও এত মানুষের পৃথিবীতে এক বিন্দু সাড়া জাগাতে না পারে !

টর্চের আলোয় সে বিভীষিকাটা যেন পাতাল-পুরীর দুঃস্বপ্ন।

—শা-লা, খুনী।

হাতের ব্যাটনটা দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বুলাকীর মাথায় ঘা বসালো সার্জেণ্ট। মাথা ঘুরে বুলাকী পড়ে গেল মাটিতে, ডাল-হাউসি ফেরত ট্রামের ভদ্রবাবুদের প্রহারে যেমন করে জর্জরিত হয়ে সে পড়ে গিয়েছিল। চোখের সামনে অন্ধকার গলি, টর্চের আলো একসঙ্গে আবর্তিত হয়ে গেল, গঙ্গার ধারে কুড়িয়ে পাওয়া সোনার মুহূর্তটি চুরমার হয়ে তলিয়ে গেল সীমাহীন একটা তমসার ভেতরে।

বৃত্ত

প্রথমটায় ব্রজেন পাল রাজী হয়নি। কিন্তু নীলকণ্ঠ টাকার অঙ্কটা যত বেশী বাড়াতে লাগল, অন্ধকারে তত বেশী করে হিংস্র জানোয়ারের মতো জ্বলে উঠতে লাগল ব্রজেন পালের চোখ। তারপরে এক সময়ে দেখা গেল তিনটে আগুন একসঙ্গে জ্বলছে। দুটো চোখ আর একটা বিড়ির রক্তদীপ্তি।

রাতটা যেমন অন্ধকার তেমনি থমথমে। সামনে তিনটে টানা রেললাইন পড়ে আছে। অন্ধকারে তাদের দেখা যাচ্ছে না, শুধু ঘষা ইস্পাত ঝিকিয়ে উঠছে। আর রেলের যে বাঁধটার ওপরে ওরা বসে আছে, তার তলা দিয়ে খরস্রোতে চলেছে বর্ষার জল। পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে তা থেকে তীব্র একটা গর্জন উঠছে—আর সেই গর্জনের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছে ব্রজেন পাল, শুনতে পাচ্ছে নিজের রক্তের মধ্যে। তা ছাড়া সমস্ত নীরব, সমস্ত নিঃসাড়। শুধু দূরের জংশন স্টেসনটা একরাশ লাল-সবুজ আলোর মালা দুলিয়ে জাগছে রাত্রির অতন্দ্র প্রহর।

হাতের বিড়িটা নীচের খরধারার ভেতরে ফেলে দিয়ে ব্রজেন পাল একবার ঠোঁট দুটোকে চেটে নিলে। টাকার অঙ্কটা মগজের মধ্যে যেমন মদের নেশার মতো ঝিম ঝিম করছে, তেমনি শুকিয়ে উঠেছে বুকের ভেতরটা। স্টেশনের একটা লাল সিগন্যালের দিকে চোখ রেখে ব্রজেন পাল বললে, কিন্তু দায়িত্বটা বুঝতে পারছেন তো? যদি ফাঁস হয়ে যায় তাহলে যথাসর্বস্ব তো যাবেই, বছর পাঁচেক শ্রীঘর বাসও করতে হবে নির্ঘাৎ।

—আরে না—না। এবারে বিড়ির বদলে পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের করলে নীলকণ্ঠ। পরম সমাদরে তারই একটা ব্রজেন পালের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, দুদিন ওখানে বন্ধ থাকলেই আর দেখতে হবে না। আপনার বন্দোবস্ত ঠিক আছে তো? তা হলেই হল।

ঘচ্ করে দেশালাই জ্বাললে নীলকণ্ঠ। তার আলোতে ব্রজেন পালের লোভাতুর ভীত মুখখানা মুহূর্তের জন্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নীলকণ্ঠের মনে হল সে মুখ যেমন বীভৎস, তেমনি ভয়ানক।

—আমার বন্দোবস্ত?—কর্কশভাবে ব্রজেন পাল হেসে উঠল: যে সব নমুনা আমার আছে, তাদের পাল্লায় পড়ে মাঝে মাঝে আমারই মাথা বেঠিক হওয়ার জো হয়। আর এ তো মেয়েমানুষ। ওদেরই ক'টার সঙ্গে এক রাত একটা ঘরে পুরে রাখলেই আর দেখতে হবে না।

—যাক, তাহলে ভাবনা নেই।—নীলকণ্ঠের গলা প্রশান্ত আর নিরুদ্বিগ্ন শোনালো: আপনি কিছু ভয় পাবেন না ডাক্তারবাবু। অত বড় একটা সম্পত্তির ওয়ারিসান যদি হয়ে যেতে পারি তাহলে আপনাকেও যে ঠকাবো না এ একেবারে পাকা কথা বলে দিচ্ছি।

তবু ব্রজেন ডাক্তারের সংশয় যাচ্ছে না। নীচে বাঁধের জলে গর্জন বাজছে—ওদিকে স্টেশনের আলোগুলো তেমনি তাকিয়ে আছে নিষ্পলক ভৌতিক দৃষ্টিতে। ওপরের মেঘে ভরা আকাশটা যেন কালো মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো। একটা অদ্ভুত এবং বিশ্রী ভীতিকর পরিবেশ। ব্রজেন পালের গায়ের রোমকূপগুলো শিরশির করতে লাগল। ঘামে ভিজে যেতে লাগল জামাটা।

অন্ধকারের ভেতরে একটা সাপের মতো নিঃসাড়ে এগিয়ে এল

নীলকণ্ঠের ঠাণ্ডা হাতটা। আর সাপের ছোঁয়া লাগলে যেমন করে মানুষ আঁতকে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবেই চমকে উঠল ব্রজেন ডাক্তার। কিন্তু এ সাপের ফণায় বিষ নেই—আছে এক তাড়া নোট।

নীলকণ্ঠ বললে, এখন এই দেড়শো রাখুন। কাজ হয়ে গেলে বাকীটা পাবেন। আর তা ছাড়া মাসে মাসে—অসমাপ্ত কথাটাকে সমাপ্ত করে দিয়ে একসারি ঝকঝকে দাঁতের ঝিলিক পাওয়া গেল।

হাতের মধ্যে পনেরোখানা নোটের স্পর্শ। কেমন গরম—যেন জীবন্ত। খস খস খচ খচ শব্দে দুর্বোধ্য ভাষায় যেন কী একটা তারা বলবার চেষ্টা করছে। যেন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে অনেক ভবিষ্যতের—অনেক রোমাঞ্চকর সোনালী সম্ভাবনার। দূর সম্পর্কের বিধবা খুড়ীমা বিমলা দেব্যাকে রাতারাতি পাগল করতে পারলে পনেরো হাজার টাকার ওয়ারিশ হবে নীলকণ্ঠ। আর সেদিন—সেদিন পরোপকারী ব্রজেন ডাক্তারও যে ফাঁকি পড়বে না—এ আশা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সঙ্গত। আর তা ছাড়া আইনের একটি দড়িতেই যখন দুজনের ভাগ্য বাঁধা পড়েছে, তখন আর—

প্রায় নিঃশব্দ গলায় ব্রজেন ডাক্তার বললে, রাজী।

আকাশে তারা নেই—শুধু স্তূপাকার নীরন্ধ্র মেঘ। দূরে স্টেশনের আলোগুলো তেমনি নিষ্পলক ভৌতিক চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। আর তেমনি করে বাঁধের খরস্রোতা বর্ষার জলের সঙ্গে ঐকতান মিলিয়ে ব্রজেন ডাক্তারের বুকের রক্তও গর্জন করতে লাগল।

কলকাতা থেকে মাইল পনেরো দূরে ব্রজেন ডাক্তারের উন্মাদ নিকেতন।

ক্যাম্বেল থেকে পাশ করে কিছুদিন পশার জমাবার চেষ্টা করেছিল শ্রীরামপুরে, কিন্তু পশার জমলো না। দেনার জালায় ডিস্‌পেন্‌সারী বিক্রি হয়ে গেল, মনের দুঃখে গভীর একটা সংসার-বৈরাগ্য অবলম্বন করে সে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলে। কম্পাউণ্ডার হারাধন খবরের কাগজে বার কয়েক বিজ্ঞাপন দিয়েও যখন কোনো হদিশ পেলে না, তখন গোটা কয়েক আয়ুর্বেদীয় মহৌষধের শিশি সাজিয়ে সে ভৈষজ্যশাস্ত্রী হয়ে বসল।

ব্রজেন ডাক্তার ফিরল প্রায় একবছর পরে। হরিদ্বার না লছমন ঝোলায় কোন্ এক ত্রিকাল-দর্শী মহাপুরুষের সে সাক্ষাৎ পায়। বহুদিন তাঁর সেবা করায় তিনি তুষ্ট হয়ে যাবতীয় উন্মাদ রোগের দৈব-চিকিৎসার পদ্ধতি ব্রজেন ডাক্তারকে বাত্‌লে দিয়েছেন। তাঁরই উপদেশে এবং আদেশে শুধু মানব সমাজের কল্যাণের জন্যেই ব্রজেন ডাক্তার লোকালয়ে ফিরে এসেছে। কোন লাভ না নিয়ে একমাত্র ওষুধ তৈরীর খরচার বিনিময়েই নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী ব্রজেন ডাক্তার এখানে উন্মাদ নিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেছে।

তারপর আস্তে আস্তে পশার জমে উঠেছে। প্রথমে ছিল টালির ঘর, এখন সেখানে তুলেছে তিনখানা ছোট ছোট দালান। কোনোখানে রোগী রেখে যারা সুফল পায়নি, তারা এসে ব্রজেন ডাক্তারের দ্বারস্থ হয়েছে। চিকিৎসা কতদূর কী হয় তা জানে ব্রজেন ডাক্তার আর জানেন সেই ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের সেটা দ্রষ্টব্য নয়। একটা আশ্বাস দরকার—একটা অপ্রিয় কর্তব্যবুদ্ধিকে পরিতুষ্ট রাখা দরকার। মৃত্যুকে সহ্য করা যায়—সে চিহ্ন রাখে না, দুদিন পরে আপনা

থেকেই যায় বিস্মৃতিতে বিলীন হয়ে, নিছক একটা মনোবিলাসের মধ্যেই তার পরিসমাপ্তি। কিন্তু মৃত্যুর চাইতে যা ভয়ঙ্কর—যা জীবনের একটা মর্মান্তিক বিদ্রূপ, তাকে সহ্য করা অসম্ভব। মানুষ পাগলিকে গুলী করে মারতে পারে না, গলা টিপে শেষ করে দিতে আইনের বাধা আছে, তাই তাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়।

সুতরাং নীলকণ্ঠের দোষ নেই। খুড়ীমা বিমলা দেব্যা অবশ্য পাগল নন—কিন্তু পাগল হলে কী ক্ষতি ছিল? অন্তত নীলকণ্ঠের সহজ বুদ্ধিতে তার জবাব মেলে না। নিঃসন্তান বিধবা মানুষ, অত বিষয় সম্পত্তি তাঁর কী প্রয়োজনে লাগবে? শুধু যখের মতো আগলে থাকা—শুধু নীলকণ্ঠের লোলুপ, ভোগাতুর মনটাকে বিড়ম্বিত করা। এক মুঠো আতপ চাল, একখানা শাদা থান আর দশটাকা করে কাশীবাসের মাসোহারাই যথেষ্ট বিমলা দেব্যার পক্ষে। কিন্তু সে কথা বুঝবেন না বিমলা। তিনি আগলে রাখবেন, আঁকড়ে রাখবেন। যে টাকা হাতে পেলে নীলকণ্ঠের এই উপবাসী দরিদ্র জীবন পৃথিবীর যা কিছু উপভোগকে নিঃশেষে আয়ত্ত করতে পারে, সেই টাকা আটকে রাখবেন বিমলা, বন্দী করে রাখবেন—আর সেই সঙ্গে বঞ্চিত করে রাখবেন তৃষ্ণার্ত ক্ষুধাতুর নীলকণ্ঠকে।

যে কারণে মানুষ পাগলকে খুন করে না, সেই কারণেই নীলকণ্ঠ একটা নিষ্ঠুর নির্মম থাবা বসিয়ে দেয়নি বিমলার গলায়, নিষ্পেষিত করে দেয়নি তাঁর কণ্ঠনালীকে, একটা দায়ের কোপ বসিয়ে দেয়নি তাঁর ঘাড়ে। কিন্তু পাগল হলে ক্ষতি কী? যে জীবন নিরর্থক, ভাগাড়ের শকুনের মতো যা দিনরাত পাহারা দিয়েই চলেছে, তার পক্ষে পাগল হওয়াই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

অতএব বিমলার হাঁপানির জন্যে তারকেশ্বরে ধন্না দেওয়াটা অত্যন্ত দরকার। বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করালে নীলকণ্ঠ। বিকাল বেলায় রওনা দিয়ে রাত প্রায় আটটার সময় ওরা দুজনে এসে নামল জংশন স্টেশনটাতে।

হাতের মালা জপ করতে করতে বিমলা বললেন, এ কোথায় এলাম নীলু?

সে কথার জবাব না দিয়ে নীলকণ্ঠ নিজেই কাঁধে তুলে নিলে বিমলার ভারী ট্রাঙ্কটা। বললে, চলো খুড়ীমা।

—কোথায় যেতে হবে? এ তো বাবার থান বলে মনে হচ্ছে না।

—না, বাবার থান নয়। সকাল বেলায় এখান থেকে গাড়ী বদল করে তারকেশ্বরে যেতে হবে। চলো, ভালো ধর্মশালা আছে, রাতটা সেখানেই কাটিয়ে—

বিমলা বললেন, তা বেশ। কিন্তু আমি তো বাবা বিধবা মানুষ, ধর্মশালার আচার-বিচার—

—সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না খুড়ীমা। আমি আছি কী করতে?—নীলকণ্ঠ এমনভাবে একমুখ হাসলে যে, বিমলার আর বলবার কিছু রইল না।

রেল লাইন ছাড়িয়ে দুজনে মেঠো পথে নেমে পড়ল। আকাশ আজো অন্ধকার—দিগন্তে যে চাঁদ দেখা দিয়েছিল, অনেকক্ষণ আগেই তা মেঘের অন্তরালে হারিয়ে গেছে। শুধু কতগুলো জলজ্বলে তারা সংশয়াকুল চোখে দৃষ্টি ফেলছে পশ্চিমের দিক্‌চক্র থেকে। দু' পাশের ডোবায় জমা বৃষ্টির জল থেকে উঠছে ব্যাঙের কোলাহল। পথের কাদায় বিমলার পা পিছলে যেতে লাগল।

হঠাৎ একটা সন্দেহে ভারী হয়ে উঠল বিমলার মন। নির্জন অন্ধকার পথ। চীৎকার করলেও কারো সাড়া পাওয়া যাবে না কোনোখানে। হাতের মালার ভেতরে বিমলার আঙুল আটকে গেল।

—কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস নীলু? তোর মতলব কী?

এক মুহূর্তের জন্যে যেন পাথর হয়ে গেল নীলকণ্ঠ। বিমলা কি বুঝতে পেরেছেন সব? কিন্তু এক মুহূর্ত মাত্র—নিজেকে সামলে নিতে নীলকণ্ঠের সময় লাগলো না।

—কেন ভয় পাচ্ছ খুড়ীমা—এসে পড়েছি। ওই যে আলো দেখতে পাচ্ছ না?

সত্যিই আলো দেখা গেল। অন্ধকার মাঠের ভেতরে ব্রজেন পালের উন্মাদ নিকেতনে আলো জ্বলছে। আগে থেকেই পাকা বন্দোবস্ত আছে নীলকণ্ঠের।

বিমলা আলো দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন: ওইটেই কি ধর্মশালা নাকি?

—নিশ্চয়।—শেয়ালের মতো শব্দ করে নীলকণ্ঠ হেসে উঠল: ধর্মশালা বৈ কি। চমৎকার জায়গা। ওখানে একবার ঢুকলে তুমি আর বেরুতে চাইবে না।

বিমলার সর্বাঙ্গে চমক লাগল। পথের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন—যেন এই মুহূর্তে তাঁর বুকের ভেতর থেকে একটা উদ্দাম ভয়ঙ্কর চীৎকার বেরিয়ে আসবে। কিন্তু বিমলা কিছু করবার আগেই একটা লণ্ঠন হাতে করে এগিয়ে এল ব্রজেন ডাক্তার। একগাল আপ্যায়নের হাসি হেসে বললে, এই যে—আসুন, আসুন।

ব্রজেন ডাক্তার বললে, চলুন, তাহলে আপনার শোবার বন্দোবস্ত করে দিই। ভয় নেই, কোনো কষ্ট হবে না।

বিমলা সংশয়গ্রস্ত হয়ে বললেন, কিন্তু নীলু?

—উনি পুরুষ, ওঁর ব্যবস্থা আলাদা। চলুন।

সামনে একটা অন্ধকার ঘর। বাইরে থেকে একটা লণ্ঠন নিয়ে ব্রজেন ডাক্তার বিমলার হাতে তুলে দিলে। বললে, সব ঠিক করা আছে, গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

লণ্ঠন নিয়ে বিমলা ঘরে ঢুকলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল—শিকল পড়ল খুট্‌ করে।

শিকল তোলবার শব্দ বিমলা হয়তো শুনতে পেতেন, কিন্তু শুনতে তিনি পেলেন না। লণ্ঠনের আলোয়, সমস্ত ঘরটা ভালো করে আভাসিত হয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা গেল যে বিমলার হৃৎস্পন্দন যেন ত্রস্ত হয়ে থেমে দাঁড়ালো।

—টাকা দাও—টাকা দাও বলছি। নইলে আমি মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হয়ে মরব।

একখানা লম্বা ঘর। তার দরজা-জানলা সব বন্ধ করা—বাতাসের অভাবে যেন নিশ্বাস আটকে আসে। একটা চাপা ভাপ্‌সা গরম—তার ভেতরে জমাট হয়ে আছে তীব্র দুর্গন্ধ, বমির গন্ধ। ঘরের তিন দিকে তিনটি তক্তাপোশ—তার বালিশ-বিছানা মেজেতে স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। আর সেখানে একটি মানুষ।

একটি মানুষ। এক লহমার মধ্যেই বিমলা সম্বিৎ ফিরে পেলেন। ছুটে পালাতে চাইলেন বাইরে। কিন্তু দরজা বন্ধ—ভালো করেই বন্ধ। খুনের গুণ জানে ব্রজেন ডাক্তার।

বিমলা চীৎকার করে বললেন, দরজা খুলে দাও—শিগ্‌গির খুলে দাও। এ আমি কোথায় এলাম? শুনছ? দরজা বন্ধ করে দিলে কেন—খুলে দাও—

বাইরে থেকে সাড়া এল না, কিন্তু সমস্ত ঘরটা সজীব হয়ে উঠল। হি-হি-হি করে একটা প্রচণ্ড কৌতুকের হাসিতে বিমলার কণ্ঠস্বর তলিয়ে গেল।

কে হাসছে? অমন করে কে হাসছে?

যে হাসছে সে একটি মেয়ে। তার সমস্ত কপালটা তাজা রক্তে রাঙা, তার গাল মুখ বেয়ে টপ টপ করে রক্ত বুকের ওপরে গড়িয়ে পড়ছে। চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা যায় না সারা গায়ে অমন রক্তস্রোত নিয়ে কেউ অমন করে হাসতে পারে কখনও। ভাপসা বন্ধ ঘরে—বমি আর নোংরার দুর্গন্ধের মধ্যে, লণ্ঠনের অস্বচ্ছ একটা রহস্যময় আলোর একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকা।

—ভয় পাচ্ছ? কেন ভয় পাচ্ছ? টাকা দেবে না? তাহলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব—ঠিক মাথা খুঁড়ে মরব।—মেয়েটা সেই রক্তাক্ত মাথাটা তেমনি করে দেওয়ালের গায়ে ঠুকতে লাগল, শাদা চুনের গায়ে জ্বলজ্বল করতে লাগল এলোমেলো রক্তের ছোপ।

ভাঙা-গলায় আর্তনাদ করে প্রাণপণে দরজা ধাক্কাতে লাগলেন বিমলা: খুলে দাও, ওগো কে আছো, খুলে দাও। এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে!

মুহূর্তে পাশের তক্তাপোশের তলা থেকে একখানা হাত বেরিয়ে এলো। একখানা শাদা হাত—তাতে এক পর্দা পাতলা চামড়া আর কয়েকখানা হাড়ের টুকরো ছাড়া কিছু নেই। লণ্ঠনের আলোয় তক্তাপোশের নীচে কিছু দেখা যায় না, মনে হয় যেন

কোনো একটা দেহহীন অশরীরী একটা অমানুষিক হাত লোলুপ-ভাবে বিমলার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিমলা চমকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সরে যেতে পারলেন না। অস্থি-সর্বস্ব সেই কঙ্কাল হাতখানা চকিতে বিমলার চুলের গোছা আঁকড়ে ধরে ফেলেছে—টান দিয়েছে দানবীয় শক্তিতে। মাথা ঘুরে বিমলা সোজা মেজের ওপরে পড়ে গেলেন, মুখ দিয়ে শুধু একটা গোঙানির শব্দ বেরুতে লাগল।

তক্তাপোশের তলায় কে যেন দাঁতে দাঁত কড়মড় করছে।

—রাক্ষুসী, ডাইনী! সোয়ামীকে খেয়েছিস, আমার বারো বছরের মেয়েটাকে চিবিয়ে খেয়েছিস, আবার আমাকেও খেতে এলি! আজ আমি তোকেই চিবিয়ে খাব।

শেষ শক্তিতে একটা ঝটকা দিয়ে বিমলা উঠে বসলেন। দম আটকে আসছে, চোখে ধোঁয়া দেখছেন—লণ্ঠনের আলোয় ভৌতিক ঘরটা যেন দৃষ্টির সামনে ঘুরপাক খাচ্ছে। মাথার ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা—ওই শাদা কঙ্কাল হাতটা একগুচ্ছ চুল আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে সমস্ত মেজেটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে—যেন বিমলাকেই খুঁজছে।

—খোলো, খোলো—দরজা খোলো। ওগো—কে আছো—বাঁচাও—

কিন্তু গলার স্বর তলিয়ে যাচ্ছে। রক্তাক্ত মাথা আর মুখ নিয়ে সেই মেয়েটা হাসছে। নিজের রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার মুখে—সেই রক্ত সে জিভ দিয়ে চেটে চেটে খাচ্ছে আর জানোয়ারের মতো একরাশ ধারালো দাঁত বের করে হেসে চলেছে অনবরত। মেজের ওপর একখানা কঙ্কাল হাত অবিশ্রান্ত কী যেন খুঁজছে।

আতঙ্কের যতটুকু বাকী ছিল এবারে তাও পূর্ণ হয়ে উঠল।

অন্ধকার কোণা থেকে বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা মূর্তি লণ্ঠনের আলোয় যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি নারী মূর্তি। গায়ের রঙ পাথরের মতো কুচকুচে কালো। বুকের ওপর উজ্জ্বল একটা শুকনো ক্ষতচিহ্ন।

আগুনের মতো দুটো চোখ বিমলার দিকে ফেলে বললে, এই মড়া এনেছিস? আমি রঁক্ষা চণ্ডী, মড়া খাব। কড়মড় করে মড়ার মাথা কাঁচা চিবিয়ে খেতে বড্ড ভালো লাগে—তুই মড়া আনিস নি?

পায়ের তলা থেকে সমস্ত পৃথিবী সরে যাচ্ছে।

—কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? বিশ্বাস হচ্ছে না এখনো?—জটা বাঁধা একরাশ চুলে ঝাঁকুনি দিয়ে সেই উলঙ্গ মূর্তিটা গর্জন করে উঠল: তবে দেখবি? ত্যাখ—ত্যাখ!

বিমলা দেখলেন। সেই বিকট মুখখানা থেকে আধ হাত লম্বা একখানা লকলকে কালো জিভ বেরিয়ে এল। আর জিভটা দুলতে দুলতে ক্রমেই তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল—যেন—যেন—

শেষবার আর্তনাদ করে দরজার গায়ে হেলে পড়লেন বিমলা। নিজের রক্ত চাটতে চাটতে সেই মেয়েটা তখনো হাসছে, তখনো কঙ্কাল হাতখানা জোঁকের মতো কতকগুলো আঙুল জড়িয়ে মেজের ওপরে কী খুঁজে বেড়াচ্ছে।......

বাইরের ঘরে তখন মদের বোতল খুলে বসেছে ব্রজেন ডাক্তার আর নীলকণ্ঠ।

আকাশে বর্ষার মেঘ গুম গুম করে ডাকছে। দুর্যোগের আশঙ্কায় পৃথিবী নিস্পন্দ। লোকালয়ের সীমা থেকে বহুদূরে এই উন্মাদ আশ্রমে অন্ধকারের প্রেতছায়া।

রক্তের মধ্যে নাচছে মদের চমচমে নেশা, বুকের মধ্যে আনন্দ-আকাঙ্ক্ষার জোয়ার। পনেরো হাজার টাকার সম্পত্তির স্বর্ণ-দীপ্তি ছায়া ফেলছে নীলকণ্ঠের চেতনায়, ফেলছে ব্রজেন ডাক্তারের মনে।

আবেগে নীলকণ্ঠ ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। ডাক্তারের একখানা হাত জড়িয়ে ধরে বললে, আর জন্মে তুমি আমার কী ছিলে ব্রাদার? বাবা, না বাবার শালা?

—তোমার শালা—বলে নিজের রসিকতায় ব্রজেন ডাক্তার হেসে উঠল।

কিন্তু তার কথা সে রাখলে। সাতদিন পরে যখন নীলকণ্ঠ গ্রামে ফিরল, তখন অবাক বিস্ময়ে সকলে শুনতে পেল, তারকেশ্বরে যাবার পথে বিমলার মাথা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়—একবারে উন্মাদ পাগল। তাই কর্তব্য-পরায়ণ নীলকণ্ঠ তাকে এখানে না এনে সোজা উন্মাদ নিকেতনে জমা দিয়ে এসেছে।

কুটিল সন্দেহে একবার নীলকণ্ঠের মুখের দিকে তাকিয়ে গাঁয়ের লোকে বললে, আহা—চুক্ চুক্।

তারপরে পথ পরিষ্কার। দিন কয়েক আদালত-কাছারী, উকিলের পরামর্শ—সব সহজ হয়ে গেল। কোনো ক্ষোভ নেই নীলকণ্ঠের—কোনো অতৃপ্তি নেই। শুধু একমাত্র আশঙ্কা বিমলা হঠাৎ কবে ভালো হয়ে যান, হঠাৎ কোন্ দিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো—

কিন্তু ভরসা আছে ব্রজেন ডাক্তার। দুঃসময়ের বন্ধু, দুর্দিনের কাণ্ডারী। যতদিন সে বেঁচে আছে ততদিন ভাবনা নেই। তবু,

মনটা যেমন উৎকর্ণ তেমনি উৎকণ্ঠ হয়ে থাকে। নীলকণ্ঠের আজ-কাল ভয় করে—একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক ভয়। কালো মেঘের মতো ঘন সংশয়ে চেতনা আকীর্ণ হয়ে থাকে। রাত্রে ঘুমের মধ্যে মনে হয়—বহু দূরে অন্ধকারে কারা যেন পাগলের মতো অস্বাভাবিক গলায় চীৎকার করছে; মুখের ওপর হঠাৎ যেন কার একটা উষ্ণ নিশ্বাস এসে পড়ছে—কার? বিমলার? বাইরে অন্ধকারে শুকনো পাতার ওপরে কী চলাফেরা করছে—শেয়াল না পুলিশ?

ঘুমের ঝোঁকটা ভেঙে যায়। চমকে বিছানার ওপরে উঠে বসে নীলকণ্ঠ,—মাথার ভেতরে রক্ত দাপাদাপি করে—মাতালের মতো লাফাতে থাকে শিরাগুলো। ঘরে অন্ধকার—বাইরে অন্ধকার। জানলার কাছ থেকে কে সরে গেল? ব্রজেন ডাক্তারের ওপর বিশ্বাস রাখতে ভরসা হয় না, যদি কখনো মদের ঝোঁকে—

ঘরের এক কোণে মালসা থেকে আগুন নিয়ে নিজেই হুঁকোটা ধরায় নীলকণ্ঠ। এত রাত্রে চাকরকে ডাকতে ইচ্ছে করে না—কেমন ভয় করে, কেমন সংশয় জাগে। ঘরে লোহার সিন্দুক—কোমরে চাবির তাড়া। যে-কোনো অসতর্ক মুহূর্তে ওই চাকরটাই হয়তো গলাটা টিপে ধরতে পারে। বিশ্বাস নেই কাউকে—পৃথিবীর কাউকে না—ব্রজেন ডাক্তারকেও নয়।

—কে?

নীলকণ্ঠ চমকে উঠল। বারান্দায় জুতোর শব্দ।

—কে? কে ওখানে?

—আমি।

—আমি কে?—প্রায় বিকৃত গলায় ঘর-ফাটানো চীৎকার উঠল।

—আমি সিতিকণ্ঠ।

ঠক্ করে হাতের হুঁকোটা রেখে বিদ্যুৎগতিতে নীলকণ্ঠ দাঁড়িয়ে পড়ল। খড়াস করে খুলে ফেললে দরজাটা, হাতের লণ্ঠনটার তেজ বাড়িয়ে দিলে।

—এত রাত্তিরে বাইরে কী করছ?

আঠারো বছরের ছেলে সিতিকণ্ঠ বাপের মুখের দিকে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। অপরাধীর মতো জবাব দিলে, ঘরে বড্ড গরম, একটু হাওয়া—

ঘরে বড্ড গরম!—বিশ্রীভাবে মুখটাকে ভেংচে উঠল নীলকণ্ঠ: তাই দুপুর রাতে বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছ? তুমি জমিদারের ছেলে, তাই না? টাকার গরমটা আজকাল বুঝি একটু বেশী ঠেকছে?

নীলকণ্ঠের মুখের ভাব দেখলে মনে হয়, যে-কোনো সময় একটা প্রকাণ্ড চড় সে বসিয়ে দিতে পারে। এক পা এক পা করে পিছোতে লাগল সিতিকণ্ঠ।

—জমিদারের ছেলে!—বিকটভাবে নীলকণ্ঠ বলে চলল: সম্পত্তির মালিক হবে! সে গুড়ে বালি—সে গুড়ে বালি। আমি শিগগীর মরব না, আমি পাগলও নই, বুঝেছ? যদি কোনো মতলব থাকে সেসব ছাড়ো, যাও, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। বুঝেছ? এক্ষুণি যাও।

পরক্ষণেই বেগে ঘরে ঢুকে পড়ল নীলকণ্ঠ। দড়াম্ করে সশব্দে আটকে দিলে হুড়কোটা। দরজাটা খুব শক্ত করে বন্ধ করা চাই—আরো শক্ত করে। কাল থেকে ভেতরেও একটা তালা লাগাবার বন্দোবস্ত করবে সে।

অথচ দিনের বেলা কোনো গোলমাল নেই। ভোর হওয়ার আগেই নীলকণ্ঠ বাইরে বেরিয়ে আসে। হাত-মুখ ধোয়, চা খায়, তারপর ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে বেরিয়ে যায় খামারে। এখন খন্দের সময়—আদায় তহশীলের দিন। নিজে ভালো করে দেখাশোনা না করলে চলে না।

আশ্চর্য, প্রজাদের কাছে নীলকণ্ঠ যেন মাটির মানুষ।

এত বড় সম্পত্তির মালিক—দশখানা গাঁয়ের ভেতরে একটা দাঁদরেল জমিদার। কিন্তু কোনো অহমিকা নেই। মাঠে যেখানে ফসল কাটা হচ্ছে সেখানে ঘোড়া বেঁধে একটা বাব্‌লা গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে। প্রজাদের সঙ্গে তামাক খায়, গল্প করে।

অত্যন্ত ঘরোয়া গল্প। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ।

—কিরে, তোর ছেলে কেমন? জ্বর ছেড়েছে? যদি না ছাড়ে আমার ওখানে পঠিয়ে দিস। ভালো হোমোপ্যাথিক ওষুধ দেব—একেবারে সেরে যাবে। হ্যাঁ—এবার তোদের গাঁয়ে একটা কুয়ো করে দেব। ভারী জলের কষ্ট—তাই না? কিন্তু দেখছিস তো যুদ্ধের বাজার—চুন-সুরকি কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, নইলে—

প্রজারা খুশি হয়, কৃতজ্ঞ হয়, আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। নীলকণ্ঠকে সাক্ষাৎ দেবতা বলে মনে হয় যেন। দরকার হলে খাজনা-পত্তরও মাপ পাওয়া যায় তার কাছে। তার দয়া আছে, বিবেচনা আছে।

নীলকণ্ঠ দুলে দুলে হাসে, স্নেহভরে তাকায় আর দা-কাটা তামাক টানে তারিয়ে তারিয়ে। বাব্‌লা গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় খোলা মাঠের মধ্যে মনটাও যেন খুলে গেছে।

—খুড়ী-ঠাকরুণের আমলে কেমন ছিলি তাই বল্‌?

বারে বারে নীলকণ্ঠ এই প্রশ্ন করে—কী জবাব পেলে সে খুশি হয় প্রজারাও তা জানে।—উঃ সে কথা বলবেন না বাবু। একেবারে সাক্ষাৎ যম। একটি পয়সা রেয়াত করতেন না, বুকে হাঁটু দাবিয়ে আদায় করতেন।

—এই ছাখ্—এই ছাখ্।—তেমনি দুলে দুলে হাসে নীলকণ্ঠ: এ না হলে অমন হয়? এ হল পাপের প্রাচিত্তির, বুঝলি? রাইয়ৎ বলে কি মানুষ নয় তারা? ধর্ম জেগে আছেন না? তিনিই বিচার করেন।

প্রজারা সায় দেয়।

—তাই ধর্মস্থানে গিয়েই একেবারে বেহেড্ পাগল। এ বাবা ধর্মের কল, বাতাসে নড়বে, এর ওপরে কোনো কথা আছে নাকি? বল্, তোরাই বল্ না? বল্ সত্য কিনা?

সত্যিই তো। কোন ভুল নেই, সন্দেহ নেই কারো। তবু বারে বারে জিজ্ঞাসা করে নীলকণ্ঠ, ঘুরে ঘুরে ওই একটা কথাকেই যাচাই করতে চায়, প্রমাণ করতে চায়। শুধু বাইরের পৃথিবী নয়, যেন নিজের মনের কাছেও সে আশ্বাস খোঁজে। ধর্মের কল বৈ কি। কত প্রজাকেই যে বিমলা ভিটেমাটি থেকে উচ্ছন্ন করেছেন। নীলকণ্ঠ কে? শুধু নিমিত্ত মাত্র।

বেলা দুপুর গড়িয়ে গেলে সে ফিরে বাড়ির দিকে রওনা হয়। খর-রৌদ্রে ঘোড়াটা ভালো করে চলতে পারে না, চষা জমির শুকনো মাটির ডেলাগুলোতে বারে বারে হুঁচোট খায়। রোদের তাতে চাঁদি গরম হয়ে ওঠে—বুকের ভেতরটা জ্বালা করে। সত্যিই তো—এ বিমলার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সবাই একথা মেনে নিয়েছে, তবু নিজেকে কেন মানাতে পারে না

নীলকণ্ঠ! যেন চারদিকের আগুনঝরা ধূ ধূ প্রান্তরের মতো তারও মনের ভেতরে কী পুড়ে যায়? কোথায় যেন সুর মিলছে না, কোথায় যেন বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। রাত্রে ঘুমুতে পারে না,—দূরে কে চীৎকার করে, মুখের ওপরে কে গরম নিশ্বাস ফেলে, গভীর অন্ধকারে সন্দেহজনক পা ফেলে হাঁটে সিতিকণ্ঠ, নিভাননীর টাকার থাঁই আর মেটে না।

কেমন সন্দেহ হয়। ব্রজেন ডাক্তার মদের সঙ্গে তাকেও কিছু খাইয়ে দেয়নি তো? বিশ্বাস নেই, কিছুই বিশ্বাস নেই। জ্বলন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হয় নীলকণ্ঠের। চীৎকার করে বলতে চায়, না-না, দোষ নেই, কারো দোষ নেই! আমি কিছু করি নি—আমাকে নিষ্কৃতি দাও।

হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে একটা হিংস্র চাবুক পড়ে। বন-বাদার ভেঙে পাগলের মতো ছুটতে সুরু করে ঘোড়াটা—যেন একমাত্র সে-ই নীলকণ্ঠকে বুঝতে পেরেছে।

সন্ধ্যায় সামনে এসে দাঁড়ালো নিভাননী।

—শুনছ? এ মাসে আরো কিছু টাকা চাই যে।

নীলকণ্ঠ চমকে উঠল। থাবা দিয়ে সামনে থেকে সরিয়ে নিলে সিন্দুকের চাবিটা।

—কী বিরক্ত করতে এলে কাজের সময়?

—বাপু, যাচ্ছি আমি এক্ষুণি। ভয় নেই, তোমার সিন্দুকের চাবি আমি কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলবো না। আরো কটা টাকা দিতে হবে আমাকে।

—কেন?—সন্দিগ্ধ কুটিল দৃষ্টিতে তাকালো নীলকণ্ঠ।

—যা দিয়েছ ওতে সংসারের খরচ চলবে না।

—চলবে না?—হঠাৎ নীলকণ্ঠ যেন ফেটে পড়ল: কেন, মতলবটা কী? যা পারো এই বেলা গুছিয়ে নিচ্ছ বুঝি? তারপর সময় পেলেই মায়ে-ব্যাটায় মিলে আমার গলায় ছুরি চালাবে?

উপসংহারে কদর্য খানিকটা গালাগালি। ডাক-চীৎকার ছেড়ে কেঁদে উঠল নিভাননী, ছুটে এল সিতিকণ্ঠ।

—বাবা, কী হচ্ছে?

—চোপ্‌ রও শূয়ার-কা-বাচ্চা! জমিদার হবে—জমিদারের মা হবে! খুন করেঙ্গা! দোনোকে জান লে লেঙ্গা!

—কী করছ বাবা? তোমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?

—কী, কী বললি!—মুহূর্তে নীলকণ্ঠ নীল হয়ে গেল। এই ভয়ানক অনিবার্য কথাটার জন্যেই সে আশঙ্কা ক'রছিল এতদিন—প্রতীক্ষা করছিল। একদিন নীলকণ্ঠের সুযোগ এসেছিল, আজ সিতিকণ্ঠের। পৃথিবীতে একা ব্রজেন ডাক্তার নেই, অনেকে আছে—অনেক আছে সেই পাগ্‌লা-গারদের দুঃস্বপ্ন। যেমন করে বিমলার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল, মুখের দুপাশ দিয়ে থুথু গড়িয়ে পড়ছিল, কুকুরের মতো শব্দ করে তিনি নীলকণ্ঠকে কামড়ে দিতে এসেছিলেন, তেমনি করে নীলকণ্ঠও কি—

একটা নিমেষে একটা খণ্ড-প্রলয় ঘটে গেল।

দেওয়ালে ঝোলানো পাঁঠা-বলির রামদাখানা সিতিকণ্ঠের কান ঘেঁষে যেন হাওয়ায় উড়ে গেল, ঝনাৎ করে বারান্দা থেকে এক চটা সিমেণ্ট উঠিয়ে নিয়ে আছড়ে পড়ল উঠোনে। একটুর জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল মৃত্যু।

থর থর করে কাঁপতে লাগল সিতিকণ্ঠ। নিভাননী অচেতনের মতো বসে পড়ল মেঝের ওপর।

—পাগল, একেবারে পাগল! বেঁধে ফেলা দরকার।

এবারে নীলকণ্ঠ আর নড়তে পারল না। সমস্ত শক্তি যেন ওই রামদাখানা ছুঁড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। আর উপায় নেই, আর রক্ষা নেই। এবারে সিতিকণ্ঠের দিন এসেছে। এখন অমনি করেই তার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবে, তারও মুখ দিয়ে থুথু গড়িয়ে পড়বে—একটা কুকুরের মতো সেও—

হাত দুটো সিথিকণ্ঠের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নীলকণ্ঠ হঠাৎ হো হো করে হাসতে সুরু করে দিলে। দমকে দমকে হাসির ধাক্কায় গাল বেয়ে ফেনা গড়াতে লাগল।

—বাঁধো, বাঁধো আমাকে। আমি সত্যিই পাগল, একেবারে উন্মাদ পাগল।

দুর্লংঘ্য

বাপ-মা হরেশ্বর চৌধুরীর নামকরণ করেছিলেন, তার জন্যে হরেশ্বরের কোনো অপরাধ ছিল না। কিন্তু ক্লাশের ছেলেরা যখন চাঁদা করে তাকে 'হস' বলে ডাকতে শুরু করলে তখন তার আর ক্ষোভের সীমা রইল না। প্রথম প্রথম রাগ করত, কান্নাকাটি করত, মারামারি করত। দেখা গেল কোনো লাভ হয় না। বিদ্রূপের শেলগুলো আরো তীক্ষ্ণ হয়ে বেঁধে। 'হস' ক্রমশ সাদা বাংলা ঘোড়াতে এসে রূপান্তরিত হয়।

দীঘির ঘাটে হুইল-বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরছিলেন রাজেশ্বর পাল চৌধুরী। বিকেলের ছায়ায় দীঘির কালো জলে যেন কাল বৈশাখীর মেঘ ঘনিয়েছে। অনেক কালের পুরোনো দীঘি,—জটে-বুড়ির চুলের মতো শ্যাওলার রাশি কালো কাচের মতো জলের নীচে নিথর হয়ে আছে, আর তার আবছা অন্ধকারের মধ্যে ঝলক দিয়ে যাচ্ছে চুনো মাছের ঝাঁক। একটু দূরে যেখানে শ্যাওলা আর দেখা যায় না—গভীর জল থমথম করছে, ঠিক তারই উপরে রাজেশ্বরের হুইলের শোলার ফাতনাটা খুটখুট করে নড়ছিল। কাতলার ঠোকর। রাজেশ্বরের বুকে রক্ত টগবগ করে উঠছিল। বহুকালের দীঘিতে বহুকালের বনিয়াদী মাছেদের আস্তানা, সাত-আটসেরী একটা পাকা মাছের টোপ গিলে ফেলাটা দুরাশা হলেও অবিশ্বাস্য নয়।

রাজেশ্বরের সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন একজোড়া চোখ হয়ে ফাতনার ওপরে গিয়ে পড়েছে। ফাতনা নড়ছে—নড়ছে—এই—এই, সাঁ

সরে গেল। ওই আবার। রাজেশ্বর চোখে পলক পর্যন্ত ফেলতে পারছেন না—পাছে সময় বয়ে যায়। ক্রমাগত একভাবে তাকিয়ে থাকার জন্যে চোখ দুটো টন টন করে উঠছে,—কিন্তু—

—দাদা,—দাদা?

পেছনে আকুল কান্নার স্বর। রাজেশ্বর চমকে ফিরলেন। কাঁদতে কাঁদতে হরেশ্বর আসছে। গায়ের জামাটা ছেঁড়া, ধুলো-কাদায় মাখামাখি। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়।

কাতলাটা ফাতনা ডুবিয়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু সেদিকে নজর দিতে পারলেন না রাজেশ্বর। দাঁড়িয়ে উঠে ব্যগ্র ব্যাকুল বাহুতে ভাইটিকে তিনি বুকে টেনে নিলেন।

—কী সর্বনাশ! এ কী করে হল?

—ওরা মেরেছে।

রাজেশ্বর স্থির দৃষ্টিতে ছোট ভাইয়ের চোখের দিকে তাকালেন —ওরাই মেরেছে খালি? তুমি মারতে পারোনি?

—হুঁ, আমিও মেরেছি।

—বেশ করেছ। কোঁচার খুঁটে রাজেশ্বর ভাইয়ের নাকের রক্ত মুছিয়ে দিতে লাগলেন: কিন্তু মারামারি হল কেন?

—ওরা আমাকে ঘোড়া বলে যে।

দীঘির কালো জলে কাপড় ভিজিয়ে রাজেশ্বর ভাইয়ের চোখ-নাক পরিষ্কার করে দিলেন—হরেশ্বরের রক্তে আর কাদায় তাঁর কাপড়ের প্রান্ত রাঙা হয়ে গেল। হরেশ্বরকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে রাজেশ্বর ঘাটলায় বসলেন।

আকাশে সূর্য ডুবে গেছে। কালো কাচ ক্রমশ কালো কালি হয়ে গেল, জটে-বুড়ির চুলের গোছা হারিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

সুপুরি বনের ওপরে সন্ত ফোটা চাঁপা ফুলের মতো বড়ো একটা তারার মুখ ভেসে উঠল।

রাজেশ্বর কথা বললেন। আসন্ন সন্ধ্যার কালো দীঘিটার মতোই গভীর শোনালো তাঁর কণ্ঠস্বর: ওরা তোমাকে ঘোড়া বলে ডাকলে তোমার লজ্জা হয়?

—হুঁ।

—কেন? ঘোড়ার ধর্মই হচ্ছে গতি—জীবন। যদি রেসের ঘোড়ার মতো হতে পারো, তার চাইতে বড়ো আর কী আছে? এগিয়ে যাও, পেছনে ফেলে যাও সকলকে। কেমন, পারবে না?

হরেশ্বর কী বুঝল সেই জানে। মাথা নেড়ে জবাব দিলে, পারবো।

দীঘির ঘাটে অন্ধকার নেমেছে। পৃথিবী আর জলের রঙ একাকার হয়ে গেছে, শুধু মাঝে মাঝে ঝিকমিকিয়ে উঠছে সিঁড়ির উজ্জ্বল মার্বেলের দীপ্তি। আর সুপুরি বনের ওপরে উঁকি মারছে সন্ত ফোটা চাঁপা ফুলের মতো সন্ধ্যা তারাটা।

৬

দশটা বছর কেটে গেল।

দশ বছর বয়স বেড়েছে হরেশ্বরের, অনেক বড়ো হয়েছে সে। রাজেশ্বরের কথা মিথ্যা হয়নি—রেসের ঘোড়ার মতোই জীবনের অনেকখানি পথ এগিয়ে গিয়েছে সে। তার গতিকে আজ নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা রাজেশ্বরেরও নেই।

কিন্তু আশ্চর্য, রাজেশ্বর কোন কথা বলেন না।

নায়েব সামন্ত মশাই খাতা নিয়ে এসে ছিলেন। গোটা কয়েক

সই করিয়ে নিয়ে চাপা গলায় বললেন, বড়বাবু, এমন করলে তো আর চলে না।

ফরসিতে আলগা একটা টান দিয়ে রাজেশ্বর বললেন, কী হয়েছে?

—এই—ইয়ে—মানে ছোটবাবু—

—ছোটবাবু? আধবোজা চোখদুটো একবার তীক্ষ্ণ প্রখর করে তুলেই পরক্ষণে সে দুটোকে বন্ধ করে ফেললেন রাজেশ্বর: কী করেছে ছোটবাবু?

—যা তা করে টাকা নিচ্ছেন। এমন করলে সম্পত্তি রাখা যাবে না।

ফরসির ধোঁয়ায় রাজেশ্বরের মুখখানা প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তিনি নীরবে শুনে যেতে লাগলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

—মার্চ কিস্তির টাকা যোগাড় করে রেখেছিলাম, কাল সদরে পাঠাতে হবে। ছোটবাবু এসে তিনশো টাকা জোর করে নিয়ে গেলেন। এমন হলে কেমন করে সামলাব আমি?

প্রসন্ন হাসিতে রাজেশ্বরের মুখ যেন আলো হয়ে উঠল।

—যাক নিয়ে। অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।

কিন্তু সামন্ত মশাইয়ের মুখে মেঘ কাটল না। খাতার একটা পৃষ্ঠার দিকে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন তিনি, অকারণেই চশমাটাকে আর একবার ঠিক করে নিলেন।

—কথাবার্তাগুলোও খুব ভাল নয় বড়বাবু।

—কী রকম?

—এই—মানে, ছোটবাবু বলছিলেন—

—কী বলছিলেন? রাজেশ্বর যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

—বলছিলেন জমিদারী বড়দার নয়, আমারও। বড়দাই সর্বেসর্বা হয়ে থাকবে আর আমি পাঁচটা টাকার জন্যে ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াব, সে চলবে না। আমি যা বলব তাও মেনে চলতে হবে।

রাজেশ্বর নির্বিকার মুখে বললেন, বেশ মেনে চোলো।

সামন্ত মশাই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা জোগালো না। আস্তে আস্তে বললেন, কিন্তু এমন করলে—

ক্লান্তভাবে হাত নেড়ে সামন্ত মশাইকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন রাজেশ্বর: থাক, সামন্ত থাক। এ নিয়ে আর আলোচনা কোরো না, ভালো লাগে না আমার।

বিস্মিত ক্ষোভে খাতাপত্রগুলো বেঁধে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সামন্ত। বিশ বছরের ওপর এদের সেরেস্তায় তিনি কাজ করছেন। এ বাড়ির নাড়ী-নক্ষত্র তাঁর চেনা। নৌকোর তলাকার ফুটো দিয়ে হু-হু করে জল উঠছে আজ—একে আর রাখা যাবে না। শনিগ্রহের মতো এই বাড়িতে দেখা দিয়েছে হরেশ্বর। লেখাপড়া শিখেছে, তার সঙ্গে বদখেয়াল শিখেছে পাঁচগুণ। এমন কুকীর্তি নেই যা তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু রাজেশ্বরের এই নির্বেদ কেন? মরবার সময় কি মানুষের এমনি করেই বুদ্ধিনাশ হয়?

নিজের ঘরে ফরসির নলটা মুখে দিয়ে ঝিমন্তের মত পড়ে রইলেন রাজেশ্বর। আর তাঁর ভালো লাগে না। নিঃসঙ্গ বিপত্নীক জীবন। ছেলে একটি হয়েছিল, চার বছর বয়স না হতেই একদিন ডিপ্‌থেরিয়ায় মরে গেল। একমাত্র ছোট ভাইটিকে বড়ো করে তোলা ছাড়া জীবনের আর কোন আকর্ষণই তিনি অনুভব করেন নি। ছোট ভাই আজ বড় হয়েছে, কিন্তু মানুষ হয়েছে কি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজেশ্বর।

ঘরে হঠাৎ উদ্ধত জুতোর শব্দ। রাজেশ্বরের সমস্ত বিশ্রামটা বিস্মিত হয়ে উঠল মুহূর্তে। হরেশ্বর এসেছে।

—দাদা!

—বসো। কিছু বলবে?

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বেশ সাড়াশব্দ করেই হরেশ্বর বসল। তারপর ভূমিকামাত্র না করে তীক্ষ্ণস্বরে বললে, আমাকে কি তুমি অপমান করতে চাও দাদা?

—কেন কী হয়েছে?

—তোমার কর্মচারীদের তুমি শিখিয়ে দিয়েছ আমাকে অবজ্ঞা করতে।

—না ভাই, কখনো নয়।

—নিশ্চয়।—তীব্র গলায় দাদাকে যেন একটা ধমক দিলে হরেশ্বর: আমি টাকা চাইতে গেলেই সামন্ত মশাই অমন করে ওঠে কেন বলতে পারো?

—সম্পত্তিটা তো রাখতে হবে ভাই।

—সে দায়িত্ব কি আমার নেই?—হরেশ্বরের চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল: সেটা আমিও বিলক্ষণ বুঝি।

ফরসির খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে রাজেশ্বর বললেন, বেশ তো, আজ থেকে সে দায়িত্ব তুমিই নাও। তুমিই সেরেস্তার দেখাশোনা করো ভাই—আমি চুপচাপ একপাশে পড়ে থাকি।

হরেশ্বর থেমে গেল। দাদার কাছ থেকে এমন জবাব যে আশা করেনি। আজ সে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছিল—উত্তেজিত করতে এসেছিল। কিন্তু আশ্চর্য—ব্যর্থ হয়ে গেল সমস্ত।

সামনে খোলা জানালা। ওপারে দীঘির কালো জলে সকালের

রোদ জ্বলছে। তার ওপাশে সুপুরির বন দুলে উঠছে বাতাসে। সেদিকে তাকিয়ে অকারণ অর্থহীন বিদ্বেষে মনের ভেতরটা জ্বলে যেতে লাগল হরেশ্বরের।

বড়ো হয়েছে সে—বয়েস বেড়েছে তার। নিজের রক্তের মধ্যে দোলা দিয়েছে পাল চৌধুরী বংশের অনমনীয় ঔদ্ধত্য। রেসের ঘোড়ার মতো সকলকে ছাড়িয়ে যাবে—পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে এম্‌নি একটা সঙ্কল্প সংক্রামিত হয়ে গেছে শিরায় শিরায়, সঞ্চারিত হয়ে গেছে অস্থিমজ্জাতে। ঠিক সজ্ঞানভাবে নয়—একটা অবচেতন ইচ্ছার প্রেরণায় সে কামনা করে কেউ তার সামনে এসে দাঁড়াবে না—যে দাঁড়াবে তাকে সে ক্ষমা করবে না।

ঠিক এইজন্যেই রাজেশ্বরকেও ক্ষমা করতে পারে না সে।

অথচ আশ্চর্য, রাজেশ্বরের কাছে তার অবাধ প্রশ্রয়! বড়ো হয়ে ওঠবার পরে তার কোনো কাজে কখনো বাধা দেননি রাজেশ্বর। যার তার গায়ে নির্বিচারে হাত তুলেছে, মাতলামি করেছে বাড়ির মধ্যে, প্রকাশ্য দিনের বেলায় বাগ্দীপাড়ার মেয়েদের নিয়ে বজরা ভাসিয়েছে শঙ্খিনীর জলে। রাজেশ্বর কোন কথা বলেন নি।

কিন্তু কেন? কেন কথা বলেন না রাজেশ্বর? প্রতিবাদ করেন না তিনি, গালিগালাজ করেন না, কটূ কুশ্রীভাবায়? তা হলে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে হরেশ্বর, নিজের শক্তির পরিচয় দিতে পারে।

কিন্তু রাজেশ্বর চুপ করে থাকেন। এ কি ক্ষমা না অনুকম্পা? ভাবতেই হরেশ্বরের রক্তের মধ্যে ধূ ধূ করে যেন আগুন জ্বলে যায়। সে ক্ষমা চায় না—অনুকম্পার প্রত্যাশীই নয়। তবে এ কি অবজ্ঞা? তাই সম্ভব। রাজেশ্বর চিরদিন তাকে ছোটই মনে করবেন, মার্জনা

করবেন তার সমস্ত অপরাধ। সে কখনো বড়ো হতে পারবে না, প্রমাণ করতে পারবে না নিজেকে! তার সমস্ত চঞ্চলতার অনেক ওপরে তিনি স্থির প্রশান্ত হয়ে বসে থাকেন, আর হরেশ্বর যত বেশি ছুটে বেড়াবে, নিজেকে সে তত বেশি ছোট বলেই প্রমাণ করে যাবে।

বিদ্যুতের মতো উঠে দাঁড়ালো হরেশ্বর। সমস্ত ঘরটা একবার পায়চারি করে নিলে অসংযত অস্থির পা ফেলে। তারপর দুটো জ্বলন্ত চোখ মেলে বললে, তোমার ওসব জমিদারী চাল ছেড়ে দাও। আমার সমস্ত সম্পত্তি আলাদা করে দাও—ঝঞ্ঝাট মিটে যাক।

কথাটা শেষ করে সে আর উত্তরের অপেক্ষা করলে না। জুতোর শব্দে ঘর কাঁপিয়ে বেগে বেরিয়ে চলে গেল।

পরদিন থেকেই দেখা গেল রাজেশ্বর সমস্ত জীবনের গতিটাই যেন বদলে ফেলেছেন।

তাঁর এমন ধর্মে মতি কবে থেকে হয়েছিল কে বলবে। কিন্তু বহুদিনের অনাদৃত রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে আবার ঝাঁট পড়ল—আনাচকানাচ থেকে ছত্রভঙ্গ চামচিকের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল এদিকে ওদিকে। শীতলের জিনিসপত্রগুলো মেজে-ঘষে আবার ঝকঝকে করে তোলা হল—ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলল শূন্য নাটমন্দিরে। প্রায় নাস্তিক রাজেশ্বর হঠাৎ গোস্বামী হয়ে উঠেছেন।

শেষ রাত্রে হরেশ্বরের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

বারান্দার ওপারে দাদার ঘর। শোনা গেল সেখানে যেন কে গান করছে। হরেশ্বর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল বারান্দাতে।

দাদার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে একটা আলোর রশ্মি বাইরে

বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে। শোনা যাচ্ছে, দাদা পরম-ভক্তিভরে সুর করে 'চৈতন্য-চরিতামৃত' পড়ছেন :

'এই প্রেমা আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু-চর্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
এই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন—'

তীক্ষ্ণস্বরে হরেশ্বর ডাকলে, দাদা!

—কী ভাই?

—এত রাত্রে কী আরম্ভ করেছ? কাউকে ঘুমুতে দেবে না?

—অসুবিধে হচ্ছে? আচ্ছা ভাই, তা হলে থাক।

দরজার ফাঁকে আলোর রেশটা দপ করে নিবে গেল।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অসহায় আক্রোশে নিজের হাত কামড়াতে লাগল হরেশ্বর। অসুবিধে তার হচ্ছিল না, হবার কথাও নয়। তবু কেন এত সহজে মেনে নিলেন রাজেশ্বর—কেন তিনি একটা ধমক দিয়ে বললেন না যে, নিজের ঘরে বসে ধর্মগ্রন্থ পড়বার সহজ স্বাভাবিক অধিকার তাঁর আছে। হরেশ্বরকে কি তিনি এতই ছোট মনে করেন যে, তার যে কোনো অসঙ্গত অস্বাভাবিক দাবির প্রতিবাদও করার দরকার তিনি বোধ করেন না?

সামনে তারায় ভরা কৃষ্ণা রাত্রির আকাশ। প্যাঁচা উড়ে চলেছে···উড়ছে বাদুড়ের ঝাঁক। পুরোনো বাড়ির এক কোণা থেকে কঁকিয়ে উঠছে তক্ষক—ঠক্-ক্-অঁ-অঁ। দীঘির জলে বড়ো মাছ প্রকাণ্ড একটা ঘাই দিলে,—রাত্রির বুকে শব্দটা যেন কেঁপে কেঁপে ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে যেতে লাগল।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলে হরেশ্বর। আকাশের তারাগুলো

যেন তার মুখের ওপরে অবজ্ঞার হাসি সৃষ্টি করছে, তক্তকটা যেন ভেংচে চলেছে তাকে। হরেশ্বরের ইচ্ছে করতে লাগল একটা ভয়ঙ্কর কিছু করে বসে, লোহার রেলিঙে ঠুকে চুরমার করে দেয় নিজের মাথাটাকেই। এ কি হল তার? সে কি পাগল হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত?

সকাল বেলায় খাতাপত্র সামনে নিয়ে সামন্ত মশাই এসে দাঁড়ালেন। ভয়ে ভয়ে ডাকলেন, ছোটবাবু?

হরেশ্বর টেবিলের সামনে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল। মুখ ফিরিয়ে বললে, কী চান?

—একবার সেরেস্তায় আসবেন না?

কেন? বিরক্তিতে হরেশ্বরের কপাল কুঁচকে উঠল।

সামন্ত মশাই বললেন, বড়বাবু বলছিলেন আজ থেকে আপনিই সব দেখবেন, তাই—

—বড়বাবু বলছিলেন! শাঁ করে হরেশ্বর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল: কেন বড়বাবু না বললে আমার সেরেস্তা দেখবার এক্তিয়ার নেই নাকি? বড়বাবু হুকুম না দিলে তোমরা আমাকে মনিব বলে মানবে না?

হরেশ্বরের হাতে উদ্যত ক্ষুরখানার দিকে নজর রেখে এক-পা এক-পা করে পিছোতে লাগলেন সামন্ত। সত্রাসে বললেন, না-না, আজ্ঞে সে কথা নয়—

—রাস্কেল, বুড়ো শকুন! বাজের মতো গলায় গর্জে উঠল হরেশ্বর: যাও বেরোও আমার ঘর থেকে। এখনি আমি সেরেস্তায় আসছি। বড়বাবুর দয়ায় অনেক দুধ-ঘি খেয়ে মোটা হয়েছ, ওসব আর চলবে না। সব খাতা আমি তন্ন তন্ন করে দেখব—কে কত চুরি করেছ সে খবরটা আমার নিতে হবে।

দুর্গানাম জপতে জপতে সামন্ত নেমে গেলেন।

কিন্তু ওই ভয় দেখানো পর্যন্তই। হরেশ্বর সত্যি সত্যিই সেরেস্তায় এল না। সারাটা দিন একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেল আমলাদের। কথাটা শুনে রাজেশ্বর শুধু হাসলেন, বললেন, মহাপ্রভুর ইচ্ছা।

দিন তিনেক পরে একটা প্রচণ্ড কোলাহলে ঘুম ভেঙে গেল হরেশ্বরের।

নীচের থেকে আসছে খোলের শব্দ, ঝন ঝন করে বাজছে করতাল। ঠাকুরঘর আর নাটমন্দির ধূপের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে। সেখানে ঘুরে ঘুরে তাণ্ডবতালে নাচছে একদল বৈরাগী, কীর্তনের সুর আসছে:

মাধব যব মথুরাপুর গেলা—
শোকে বিবশল বরজ নারীদল
রাই হেথা ঝুরিছে একেলা—

নির্বাক বিস্ময়ে হরেশ্বর খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাপারটা সে বুঝে উঠতে পারছে না। কীর্তনের উন্মত্ত চঞ্চলতায় মনে হচ্ছে যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। কাণ্ডটা কী? তীরের মতো নীচে নেমে এল সে। তীব্র ভয়ঙ্কর গলায় চেঁচিয়ে উঠল: দাদা—দাদা!

আকাশ থেকে যেন বাজ পড়ল। কীর্তনের কলরব থেমে গেল চকিতের মধ্যে।

—দাদা?

নাটমন্দিরের ভেতর থেকে বেড়িয়ে এলেন রাজেশ্বর। সর্বাঙ্গে চন্দন সেবা, গায়ে নামাবলী। দাদার এ এক অপরূপ অপরিচিত মূর্তি। সমস্ত চোখ-মুখ থেকে যেন ভক্তি আর পবিত্রতার আলো ঠিকরে পড়ছে। এ দাদাকে সে তো কোনদিন দেখেনি।

—ডাকছিলে ভাই?

—এসব কী হচ্ছে?

—কীর্তন।

—কীর্তন! কেন? বাড়িতে কি ন্যাড়া-নেড়ীর আখড়া বসাতে চাও নাকি?

—না ভাই, আজই শেষ।—তেমনি প্রশান্ত স্নিগ্ধ মুখে রাজেশ্বর হাসলেন: কাল থেকে কেউ আর তোমাকে বিরক্ত করবে না, এমন কি আমিও না।

—তার মানে?

—ওপরে এসো, বলছি।

নীরবে রাজেশ্বরকে অনুসরণ করে হরেশ্বর দোতলায় উঠে এল। হরেশ্বরের চোখে পড়ল, দাদার পা খালি, মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা। হাতের কুঁড়োজালিতে নামজপ চলছে।

নিজের ঘরে এসে রাজেশ্বর ড্রয়ার থেকে একখানা খাম বের করলেন। বললেন, এই নাও।

—কী এ?

দানপত্র।

—কিসের? হরেশ্বর ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছে না।

—সমস্ত সম্পত্তির।

—তার মানে?

রাজেশ্বর একটা অলৌকিক স্বর্গীয় হাসি হাসলেন : সবই তোমাকে দিয়ে দিলাম ভাই। কাল আমি বৃন্দাবনে চলে যাচ্ছি, বাকী জীবনটা ওখানেই কাটাব। পারো তো কিছু মাসোহারা আমাকে পাঠিয়ো।

বোবার মতো হরেশ্বর তাকিয়ে রইল।

—বিষয়-সম্পত্তিতে আর লোভ নেই আমার। বয়েস হয়েছে, তুমি বড়ো হয়েছো, আমিও দায়িত্বের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। এখন মহাপ্রভুর নামই আমার একমাত্র সম্পদ।

হরেশ্বর তেমনি করে তাকিয়ে রইল। তার বিহ্বল দৃষ্টির সামনে রাজেশ্বরের সমস্ত মূর্তিটা যেন জ্যোতির্ময় হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সে মূর্তিটা বড়ো হয়ে উঠছে—এই ঘর ছাড়িয়ে উঠছে—আরো ওপরে উঠছে—আরো, আরো—হরেশ্বর যেন দাদার মাথাটাকে আর দেখতে পারছে না। আর আকাশ-ছোঁয়া এই বিরাট মূর্তিটার পায়ের কাছে সে পড়ে আছে যেন একটা মাটির পুতুল। এই বাধা—এই হিমালয়ের মতো বিশাল প্রতিরোধকে সে কোনদিন অতিক্রম করতে পারবে না, কখনোই না! রেসের ঘোড়া হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছে।

পাঁচ মাইল দূরে কেশবপুর থানা।

ঝড়ের গতিতে একটা ঘোড়া এসে থামল। লাফিয়ে নামল একজন লোক, তার হাতে একটা দো-নলা বন্দুক।

দারোগার সামনে এগিয়ে গিয়ে স্থির অকম্পিত গলায় সে বললে, আমার নাম হরেশ্বর পাল চৌধুরী। এই বন্দুকের গুলিতে আমি আমার দাদা রাজেশ্বর পাল চৌধুরীকে খুন করেছি, আমাকে গ্রেপ্তার করুন।

বিভীষণ

এককালে ভালো অভিনয় করতেন চাটার্জি-বাবু। শখের থিয়েটারে যখন তিনি শকুনির ভূমিকায় নামতেন তখন দর্শকদের নাকি গা ছম-ছম করে উঠত। তাঁর হাতে হাড়ের পাশাতেই শুধু ভেল্‌কি লাগত না, দর্শকের শুদ্ধ ভেল্‌কি লেগে যেত।

আজ চাটার্জি-বাবু মিলের হাজিরা-বাবু। হাতে আর পাশা নেই, এখন তিনি কালি-কলমেই মন দিয়েছেন। কিন্তু এখনো ভেল্‌কি লাগাতে পারেন। শকুনির ঠোঁটের মতো বাঁকা নাকের ওপরে দুটো কুৎকুতে চোখ শয়তানির আলোয় জ্বল-জ্বল করছে, সমস্ত মুখে এলোমেলো কতগুলো শুকনো ক্ষতের দাগ—চাটার্জি-বাবু বলেন বসন্ত হয়েছিল, যদিও কু-লোকে অন্য কথা বলে থাকে। ঘাড়টা একটু বেশি পরিমাণেই সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া, মনে হয় পিঠের ওপরে যেন ছোট-খাটো একটা কুঁজ ঠেলে উঠেছে। আর সবটা মিলে একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর চেহারা। দরকার হলে বোধ হয় অবলীলাক্রমে খুন করতে পারে লোকটা।

হাজিরা-বাবু হলে কী হয়, ম্যানেজিং ডিরেক্টারের একেবারে চোখের মণি। মিলের সকলে জানে চাটার্জি-বাবুর ওপরেই তাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। কে ছাঁটাই হবে, কার মাইনে বাড়বে, আবার কার বা পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে, এ সবই চাটার্জি-বাবুর মুখ চেয়ে আছে। বহুদিন লোকে দেখেছে, বিলিতী হোটেল থেকে মদে চুরচুরে হয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টার আর চাটার্জি-বাবু গলা জড়াজড়ি করে মোটরে উঠছেন।

এ হেন চাটার্জি-বাবু শেষকালে কিনা রাজেন্দ্রকেই অনুগ্রহ করে বসলেন!

গদি-আঁটা চেয়ার, এমন চেয়ারে রাজেন্দ্র কখনো বসেনি। মাথার ওপরে পুরো দমে পাখা ঘুরছে। টেবিলে ফুলদানিতে নানা রঙের ফুল—যেন একরাশ প্রজাপতি এসে উড়ে বসেছে। দরজায় একটা গোলাপী রঙের পর্দা হাওয়ায় দুলছে, সেদিকে তাকিয়ে রাজেন্দ্র যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল—যেন জ্বর ঘোর লাগতে লাগল। পর্দার গোলাপী রঙের ওপর বিদ্যুতের জোরালো আলো প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে, তার অত্যুজ্জ্বল প্রখরতাটা রাজেন্দ্রের স্নায়ুর মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল, সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে।

টেবিলের ওপাশে চাটার্জি-বাবু। জ্বলন্ত কয়লার টুক্‌রোর মতো দুটো চোখ আর শকুনির ঠোঁটের মতো শাণিতাগ্র নাকটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রাজেন্দ্র। পর্দার উগ্র গোলাপী আলোটার মধ্যে যেন সব কিছু নিশ্চিহ্ন আর নিঃশেষিত হয়ে তলিয়ে গেছে।

• • •

অথচ, ছিল বস্তির ঘরে একটা ছেঁড়া মাদুরে বসে। সামনে টিম টিম করে জ্বলছিল কাগজের পটি-আঁটা চিম্‌নি-ভাঙা লণ্ঠন—লাল তেলের ধোঁয়ায় চিমনির কাচটা প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। ওপরে টিনের চালের গা থেকে কতগুলো মরা চামচিকের মতো মাকড়শার জাল আর কয়লার কালির ঝুল ঝুলছিল—বাইরের ড্রেন থেকে আসছিল কাদা আর আবর্জনার গন্ধ। পাশে নিমাই সর্দারের ঘর থেকে আসছিল বেসুরো হারমোনিয়ামের সঙ্গে বেসুরো প্রেমের গান,

আর পাগলী ঝুখিয়ার মা তারস্বরে চীৎকার করে বলছিল, খুন—তেরী খুন হাম্ পী লেঙ্গে—

নিশ্চিন্ত পরিচিত পরিবেশ! নিজের ছোট ঘরটার অভ্যস্ত আরামে বসে মদের গ্লাসে চুমুক দিয়েছিল রাজেন্দ্র। নেশা করার ব্যাপারে সে একটু স্বার্থপর। দলের সঙ্গে মিশে হৈ-চৈ করে বসে সে মদ খেতে পারে না, লালাজীর দোকান থেকে একটা পাঁইট বোতল যোগাড় করে এনে সে নিরিবিলিতে খেতে ভালোবাসে, আর সেই সঙ্গে ভালোবাসে বস্তির গনেরী ধোপার ডুরে শাড়ি-পরা বউটার কথা ভাবতে।

একদিন নিমাই সর্দার এসে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল রাজেন্দ্রের ঘাড়ে। নেশায় আরক্তিম ওর দুটো জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি রাজেন্দ্রের মুখে ফেলে বলেছিল, তুই এক নম্বর শয়তান!

—কেন? কী করেছি তোর?

—একলা বসে মদ খাচ্ছিস্? জানিস্, যে লোক একা দারু খায়, সে মানুষ খুন করতে পারে?

—যা—যা—

একটা ধাক্কা দিয়ে রাজেন্দ্র ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল নিমাই সর্দারকে। পড়তে পড়তে সামলে নিয়েছিল নিমাই, তারপর বিড় বিড় করে বকতে বকতে চলে গিয়েছিল।

চিরাচরিত অভ্যাসে আজও রাজেন্দ্র তেমনি করে বোতল নিয়ে বসেছিল। সত্যিই সে স্বার্থপর। বুঝে-সুজে চলে, হিসেব করে মদ খায়। গোষ্ঠীশুদ্ধ সকলকে মদের ভোজে আপ্যায়িত করে সাত দিনের মজুরীটা নিমাই সর্দারের মতো এক রাতেই খরচ করে ফেলতে সে নারাজ। অনেক ঠেকেই রাজেন্দ্র শিখেছে যে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে খুশি করে সংসারে কোনো লাভই নেই।

এমন সময় দরজায় একটা অদ্ভুত ছায়া পড়েছিল। সাপের শিসের মতো একটা তীব্র চাপা স্বর ভেসে এসেছিল : রাজেন্দ্র!

হাত কেঁপে উঠেছিল, চলকে খানিকটা মদ পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। লণ্ঠনের আবছা আলোতেও রাজেন্দ্র চিনতে পেরেছিল দরজার গোড়ায় অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির নাকটা শকুনের ঠোঁটের মতো বাঁকানো, তার চোখ দুটো থেকে যেন জ্বলন্ত কাঠ-কয়লার আগুন কণায় কণায় ঠিকরে পড়ছে।

রাজেন্দ্র প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েছিল : চাটার্জি-বাবু!

চাটার্জি-বাবু কোন কথা বলেননি, শুধু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নিষেধ করেছিলেন। তারপর তেমনি নীরবে ইঙ্গিত জানিয়েছিলেন বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্যে। আর সঙ্গে সঙ্গেই সম্মোহিতের মতো উঠে এসেছিল রাজেন্দ্র। একটা কথা বলবার মতো তার শক্তি ছিল না, সাহসও ছিল না।

গলিতে অন্ধকার। যুদ্ধ থেমেছে, কিন্তু গ্যাস জ্বলেনি। কর্পোরেশন জানে ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারে চলাচল করতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, অনর্থক গলির মাথায় একটা আলো জ্বালিয়ে দিলে অকারণে ওদের চোখগুলোকেই পীড়িত করে তোলা হবে মাত্র।

তা ছাড়া গলিতে এত রাতে বেশি লোক ছিল না। দু-চার জন যারাও বা ছিল, এখানে এমন সময়ে চাটার্জি-বাবুর অস্তিত্ব তারা কল্পনাও করতে পারেনি। তাই সকলের দৃষ্টির অগোচরে চাটার্জি-বাবু আর রাজেন্দ্র গলি দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। শুধু কাঁচা ড্রেনের উপচে-ওঠা কাদায় একটুখানি মলিন হয়ে গিয়েছিল চাটার্জি-বাবুর নতুন গ্লেজ কিডের জুতোজোড়া।

সামনে বড় রাস্তা। সারি সারি দোকানের আলো, বিদ্যুতের

আলো—আলোয় স্নান করছিল সমস্ত। আর ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল হলদে রঙের একখানা বড় মোটর। সে মোটরের দিকে তাকিয়েই রাজেন্দ্রের হৃৎপিণ্ড আতঙ্কিত উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠেছিল। ম্যানেজিং ডিরেক্টারের গাড়ী—তাতে আর সন্দেহ কী!

চাটার্জি-বাবু সোজা এসে দাঁড়িয়েছিলেন মোটরের পাশে। বিনীত অনুনয়ে দরজা খুলে দিয়ে বলেছিলেন, ওঠো।

নেশায় শুষ্ক কণ্ঠে রাজেন্দ্র বিহ্বল বিমূঢ় গলায় বলেছিল, হুজুর—

—চুপ, কোনো কথা নয়। উঠে পড়ো। কাজ আছে।

বুকের মধ্যে থর থর করে কাঁপছিল বাঁশপাতার মতো। রাজেন্দ্র উঠে বসেছিল। মোটরের স্প্রীং-দেওয়া নরম গদিটা মুহূর্তে তাকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, যেন তলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কোন একটা রহস্যময় পাতালের অতলস্পর্শী গভীরতায়। রাজেন্দ্রের মনে হচ্ছিল যেন সে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে। আর চোখে পড়েছিল পাথরে-গড়া একটা কালো মূর্তির মতো সামনে সোফারের আসনে গিয়ে বসেছেন চাটার্জি বাবু। তার পরেই মোটর ছুটতে সুরু করে দিয়েছিল। কোথায়—কোন্ দিকে—রাজেন্দ্র জানে না। শুধু পথের দু'পাশে আলো, লোক-জন, ট্রাম, মোটর আর বড় বড় বাড়ি পাক খেয়ে উড়ে যাচ্ছিল, আর কানের মধ্যে শোঁ শোঁ করে এসে বাতাসের ঘা লাগছিল, বোঁ বোঁ করে ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথাটা।

তারপর যখন জ্ঞান ফিরে এল, রাজেন্দ্র দেখলে মাথার ওপর শন্ শন্ করে ঘুরছে পাখা। পরম যত্নে তাকে এনে একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনের ফুলদানিতে বিলিতী ফুলে যেন সাতরঙা প্রজাপতির ভিড়। দরজায় উগ্র নেশার মতো গোলাপী পর্দাটা জ্বলে যাচ্ছে।

ম্যাজিক করবার সময় জাদুকরেরা যেমন করে হাত চালিয়ে সম্মোহিতকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলে, রাজেন্দ্রের বিহ্বল দৃষ্টির সামনে তেমনি করে একবার দুলে গেল চাটার্জি-বাবুর হাতখানা। তারপর বাঁকা নাকের ছায়ায় একটুখানি হিংস্র হাসির উজ্জ্বল আভা দেখতে পাওয়া গেল।

—তারপর, তোমাদের ইউনিয়ানের খবর কী?

পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত একসঙ্গে চমকে উঠল রাজেন্দ্রের।

—ইউনিয়ান?

—হাঁ—ইউনি—য়ান—কথাটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করলেন চাটার্জি-বাবু। যেন ইউনিয়ান বস্তুটার কোনো আকার থাকলে সেটাকে সে অমনি করেই চিবিয়ে খেয়ে ফেলতেন।

রাজেন্দ্র ঢোঁক গিলল: আমি জানি নে হুজুর।

—জানো না?—পরম স্নেহভরে চাটার্জি-বাবু হাসলেন: সত্যিই জানো না? তা বেশ নাই জানলে। কিন্তু একটা কথার খাঁটি জবাব দাও দেখি? তোমাদের নাচাচ্ছে কে কে?

—কী হুজুর?—রাজেন্দ্রের বুকের ভেতর যেন হাতুড়িপেটার শব্দ হতে লাগল।

—কী হুজুর?—হঠাৎ টেবিল চাপড়ে বিশ্রী রকম একটা চীৎকার করে উঠলেন চাটার্জি বাবু: জানো কোথায় এসেছ? বাঘের গর্তে। যদি সত্যি কথা না বলো কপালে দুঃখ আছে।

রাজেন্দ্র নীরবে ঘামতে লাগল।

পরমুহূর্তেই গলার স্বর নরম হয়ে এল চাটার্জি-বাবুর: ভালো কথা শোনো। নামগুলো বলে দিলে তোমার কোন ক্ষতি নেই বরং লাভ আছে। দু'মাসের মধ্যে তোমাকে ফোরম্যান করে দেব, নগদ

তো আছেই। তা ছাড়া মালিকের সঙ্গে হরদম ঝগড়া করলে কী ফয়দা হবে তাতে? ধর্মঘট করবার জন্যে আজ যারা তোমাদের নাচাচ্ছে, চাকরি গেলে তারা তোমাদের খেতে দিতে আসবে না।

রাজেন্দ্র তবু জবাব দিলে না। গোলাপী পর্দাটা চোখের ওপর আশ্চর্য একটা ঘোর লাগাচ্ছে। তৃষ্ণায় গলাটা শুকিয়ে যেন পাথর হয়ে গেছে। ফাটা ঠোঁটটাকে সে চাটতে লাগল—আর জিভে যেন কাঁটার মতো খোঁচা লাগতে লাগল খচ খচ করে।

চাটার্জি-বাবুর ছোট ছোট চোখের দৃষ্টি সেটা এড়ালো না। টেবিলের ওপর ছোট কলিং বেলটা তিনি টিপে ধরলেন। বেয়ারা এল। তারও পরে এল রূপালী শিল-করা পেট-মোটা বোতল আর ছোট ছোট গ্লাশ।

বিদ্যুতের আলোয় গোলাপী পর্দা দুলতে লাগল, গ্লাশে টলটল করতে লাগল গোলাপী পানীয়। আস্তে আস্তে রাজেন্দ্রের চোখের সামনেও সমস্ত জগতটা গোলাপী হয়ে গেল।...

চাটার্জি-বাবুর মোটর যখন ওকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল রাত তখন বারোটা বেজে গেছে। ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে বস্তি মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে, নেশায় আর ক্লান্তিতে। সন্ত্রস্ত মার্জারের মতো পা টিপে টিপে এগোতে লাগল রাজেন্দ্র। শরীরের প্রতিটি রক্তকণায় চম চম করছে বিলিতী মদের নেশা। আর পকেটের ভেতর পাঁচখানা দশ টাকার নোট—বিশ্বাসঘাতকের পুরস্কার।

নিজের ঘরে পা দিতে যাবে, হঠাৎ অন্ধকার ফেড়ে তীব্র একটা আকস্মিক চীৎকার উঠল। চমকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল রাজেন্দ্র।

—খুন পী লেঙ্গে—তেরা খুন পী লেঙ্গে—

পাগলী দুখিয়ার মা চীৎকার করছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে

ঘরে ঢুকল, দুর্গন্ধ অন্ধকারের গর্তে যেন পলাতক একটা জানোয়ারের মতো লুকিয়ে গেল রাজেন্দ্র।

চাটার্জি-বাবুর হাতযশ আছে।

তিন দিনও দেরি হল না—চার-পাঁচ জনের ছাঁটাইয়ের হুকুম হয়ে গেল। কুলিরা আরজী পেশ করবার জন্যে এগিয়ে গেল—ম্যানেজিং ডিরেক্টার হাতে চাবুক তুলে নিয়ে বললেন, নিকালো—

কিন্তু একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল ম্যানেজিং ডিরেক্টার আর চাটার্জি বাবুর। ইতিহাসের ধারা বদলে গেছে। নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে ধরেছে অনিবার্য ফাটল, পায়ের তলায় কাঁপছে বাসুকির ফণা। সর্বংসহারও সইবার সীমা লঙ্ঘিত হয়ে গেছে। ফলে যা হওয়ার তাই হল।

সমস্ত দিন ধরে মিলের মধ্যে চাপা অসন্তোষের গুঞ্জন বাজতে লাগল। এখানে-ওখানে চলতে লাগল সতর্ক আলোচনা। চাটার্জি বাবুর শকুনের মতো নাক নতুন কিছুর গন্ধে বিস্ফারিত হয়ে উঠল—কুটিল চোখে জ্বলতে লাগল সন্ধানী দৃষ্টি।

কালি-ঝুলি মেখে বয়লারের কাছে দাঁড়িয়েছিল রাজেন্দ্র। কাঁধে কার হাত পড়ল।

শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ শিউরে গেল রাজেন্দ্রের। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ছলকে পড়ল এক ঝলক রক্ত। রাজেন্দ্র প্রায় অব্যক্ত গলায় আর্তনাদ করে উঠল: কে?

—চমকাচ্ছিস্ কেন? আমি।

ফিরে তাকাতে চোখে পড়ল নিমাই সর্দার।

—অমন চমকে উঠলি কেন? কী ভাবছিলি?

পোড়া কয়লা আর বয়লারের বাষ্পের গন্ধে ভরা এক ঝলক বাতাস বুকের মধ্যে টেনে নিলে রাজেন্দ্র। গলা শুকিয়ে উঠেছে, ভয়ে চমকাচ্ছে সমস্ত চেতনা। নিস্তেজ গলায় জবাব দিলে: কিছু না।

নিমাই সর্দার একটা বিড়ি ধরালো। দাঁতের ভিতরে বিড়িটাকে শক্ত করে ধরে বললে, ব্যাটাদের কাণ্ড দেখলি?

—হুঁ।

—যা খুশি তাই সুরু করেছে। এমন অত্যাচার আর কদ্দিন চলবে বল্ দেখি?

রাজেন্দ্র জবাব দিল না।

—কাল থেকে ধর্মঘট। মরি বাঁচি একটা শেষ লড়াই করতে হবে এইবারে।

—হুঁ।

—আচ্ছা, কোন্ শালা বিভীষণ মালিকের কাছে নামগুলো ফাঁস করে দিলে বল্ তো? ওদের জানবার তো কথা নয়। নির্ঘাৎ কোনো শূয়ারের বাচ্চা গিয়ে বলে দিয়েছে। ব্যাটাকে একবার পেলে—নিমাই সর্দারের দাঁতগুলো একসঙ্গে কড়মড় করে উঠল।

রাজেন্দ্রের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ছুটো বড় বেশী করে শব্দ করছে—ভয় হচ্ছে বাইরে থেকে নিমাই সর্দার সে শব্দটা শুনতে পাবে। কপালের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠছে নিঃসাড়ে। জিভটাকে কে যেন গলার ভেতরে টেনে গুটিয়ে নিচ্ছে—আর ঘাড়ের পাশ থেকে জেগে উঠছে বেদনার একটা তীক্ষ্মমুখ অনুভূতি। নিরুত্তরে আড়চোখে নিমাই সর্দার তাকালো রাজেন্দ্রের মুখের দিকে। বয়লারের এদিককার ঢাকনাটা খুলছে কুলিরা। ভেতরে উজ্জ্বল

রক্তের মতো গন্‌গনে আগুন জ্বলছে—একটা অসহ্য উত্তাপ এতদূরে এসেও ওদের মুখের ওপরে স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। আর সেই আগুনের আভাটা এসে পড়েছে নিমাই সর্দারের মুখে। কালো প্রকাণ্ড মুখ—বুনো জানোয়ারের মতো কতগুলো ধারালো বিশৃঙ্খল দাঁত—একটা নির্মম হিংসা যেন সর্বাঙ্গ ঘিরে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। বিদ্যুতের আলোয় চাটার্জি-বাবুকে যেমন ভয়ঙ্কর বোধ হচ্ছিল—সেই গোলাপী পর্দা থেকে যে নিষ্ঠুরতার দীপ্তি তার শকুনের মতো নাক আর অঙ্গারের মতো চোখে প্রতিফলিত হয়ে পড়েছিল—এ তারই আর এক সংস্করণ।

বিদ্যুৎ-শিহরণের মতো রাজেন্দ্রের মনে হল চাটার্জি-বাবুর হাত থেকে সে রক্ষা পেয়েছিল ; কিন্তু নিমাই সর্দারের হাত থেকে তাকে বাঁচাবে কে ?

নিমাই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু যাওয়ার আগে থমকে দাঁড়ালো একবার। বললে, শালা বিভীষণকে একবার ধরতে পারলে বয়লারের আগুনে ফেলে বেগুন-পোড়া করে ছাড়তাম !

রাজেন্দ্র যেন পাথর হয়ে রইল।

ঢং ঢং ঢং। ছুটির ঘণ্টা বাজল কারখানায়।

বাইরে বেরিয়ে এল রাজেন্দ্র। ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আজ কুলিরা উর্ধ্বশ্বাসে লাইনের দিকে ছোটেনি। দল বেঁধে তারা এখানে-ওখানে জটলা করছে—আলোচনা করছে। তাদের চোখে জ্বলজ্বল করছে নিশ্চিত সংকল্পের দীপ্তি—যে আগুন চাটার্জি-বাবুর মতো দু-চার জনের চোখেরই একচেটিয়া ছিল, হাজার হাজার চোখে তা সংক্রামিত হয়ে গেছে। কাল ধর্মঘট। এবার আর পিছিয়ে যাওয়া চলবে না—হয় এসপার নয় ওসপার। বরখাস্ত মজুরদের

ফিরে কাজে না নেওয়া পর্যন্ত তারা আর কারখানায় যোগ দেবে না।

সন্ত্রস্ত ভীরু দৃষ্টিতে একবার রাজেন্দ্র তাকালো তাদের দিকে। অপরাধের লক্ষণগুলো কি তার মুখ-চোখে সুস্পষ্ট রেখায় ফুটে উঠেছে? তার বুকের ভেতর ভীতি-চকিত রক্তের যে কলধ্বনি তা ওরা শুনতে পাচ্ছে কি? ওদের ভেতর থেকে কয়েক জন কি বাঘের মতো এই মুহূর্তে ওর ঘাড়ের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে—গর্জন করে বলবে: এই শালা হারামীর বাচ্ছা—

দ্রুত-পায়ে রাজেন্দ্র চলে এল। সন্ধ্যার অন্ধকার ভালো করে নাববার আগে বস্তির দিকে এগোতে তার সাহস হচ্ছে না। কেমন যেন ভয় করছে, কেমন যেন মনে হচ্ছে, তাকে দেখলেই পাগ্‌লী দুখিয়ার মা তার দিকে তাড়া করে আসবে, কতগুলো তীক্ষ্ণ নখ তার গলার মাংসের ভেতরে বসিয়ে দিয়ে উৎকট ভাবে হাসতে সুরু করে দেবে: খুন পী লেঙ্গে—তেরা খুন পী লেঙ্গে—

মনে পড়ল দু'বছর আগে মেশিনের বেল্‌ট দুখিয়াকে টেনে নিয়ে একেবারে ছাতু করে ফেলেছিল। সেই থেকেই দুখিয়ার মা পাগল—একেবারে উন্মাদ পাগল।

ততক্ষণে গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে সুরু করেছে রাজেন্দ্র। সামনে ঘোলা জলের ওপর দিনান্তের ছায়া নেমেছে—একদিকের জল কালো হয়ে আসছে, অন্যদিকে রক্ত ছায়া—যেন বয়লারের আগুনটা এখানে এসেও প্রতিফলিত হয়েছে। অথবা সেই রহস্যময় ঘরটা—নিশীথ রাত্রে মোটরে করে ওকে যেখানে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন চাটার্জি বাবু; মাথার ওপরে পাখা ঘুরছিল, চেয়ারের নরম গদির ভেতরে একেবারে ডুবে গিয়েছিল রাজেন্দ্র, ফুলদানিতে ফুলগুলো কাঁপছিল হাওয়ায়—যেন একরাশ প্রজাপতি তাদের হাল্কা-পাখা নাড়ছিল

আর গোলাপী পর্দার সঙ্গে গোলাপী মদের রঙ যেখানে একাকার হয়ে গিয়েছিল---গঙ্গার জলে কি তারই প্রতিফলন পড়েছে?

একটা বড় নৌকো যেখানে আধতোলা অবস্থায় পড়ে আছে, তারই পাশে রাজেন্দ্র বসে পড়ল। রাত হয়ে আসছে। একটা অস্বস্তি আর অনিশ্চিত ভয় পীড়িত করছে মনকে। কী করল—এ কী করল সে। তার এ কাজের কথা কখনো চাপা থাকবে না—যেদিন চাটার্জি-বাবুর খোসনজর ওর ওপর থেকে সরে যাবে, সেদিন হয়তো তিনি নিজেই সকলকে ডেকে এই খবরটা দিয়ে দেবেন। আর তারপর—

চোখের সামনে ভেসে উঠল বয়লারের আগুনটা। গন্ গন্ করে জ্বলছে—খাঁ খাঁ করে জ্বলছে একটা ভয়ঙ্কর রাক্ষসী ক্ষুধার মতো। ভেতরে ঠেলে দিয়ে দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিলে বাইরের কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না। মাত্র কয়েক মিনিট। তার পরেই সব পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যাবে, আর বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে একরাশ পোড়া মাংসের ভাপসা গন্ধ—

চেতনার মধ্যে অসহ্য একটা অস্থিরতা। শুধু এক পাঁইটে কুলোবে না, পুরো একটা বোতল চাই আজকে। রাজেন্দ্র উঠে পড়ল—গলির মধ্যে নিশ্চয় অন্ধকার ঘন হয়েছে এতক্ষণে। অন্ধকার—কুণ্ডলীকৃত সরীসৃপের মতো বিষাক্ত একটা দুর্গন্ধ অন্ধকার—তার ভেতর দিয়ে বিশ্বাসঘাতক রাজেন্দ্রকে কেউ দেখতে পাবে না।

সত্যিই কেউ দেখতে পেল না।

কালো একটা মদের বোতল নিয়ে নিঃসাড়ে ঘরে ঢুকল রাজেন্দ্র। বস্তিটা আশ্চর্য ভাবে নির্জন, দুখিয়ার মা চীৎকার করছে না, নিমাই সর্দারের ঘর থেকে আসছে না বেসুরো হারমোনিয়ামের সঙ্গে বিশৃঙ্খল

গানের তাণ্ডব! সব নিঃশব্দ—সব নিঃঝুম, যেন ঝড়ের আকাশের মতো একটা প্রত্যাশিত দুর্যোগের অপেক্ষায় থমথম করছে। ওদের চিরাচরিত জীবনযাত্রার সুর কেটে গিয়েছে। কাল ধর্মঘট। লড়াই সুরু। এবার আর পিছিয়ে যাওয়া চলবে না—মালিকের সঙ্গে ভাল করে বোঝাপড়া করে নিতে হবে এইবারে। এ ওদের ঝাণ্ডার শপথ—ঝাণ্ডার হুকুম।

শুধু রাজেন্দ্র এদের দলে কেউ নয়। তার জাত গিয়েছে—সে অস্পৃশ্য। কারো সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে তার ভয় করে, পাছে তার মুখের দিকে তাকিয়ে লোকে বুঝতে পারে! সে চিরকাল একা মদ খেয়েছে, একা নেশা করেছে। আজও তেমনি করে এই বিষের জ্বালা তাকে একাই বহন করতে হবে—এর ভাগ সে কাউকে দিতে পারবে না, কাউকে দেওয়াও সম্ভব নয়।

ঘরে সে আলো জ্বালালো না। অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে নিলে মাদুরটাকে। বোতলের ছিপি খুলে গলায় খানিকটা ঢেলে নিলে। কেন সে এমন করল—কেন সে এমন ভাবে জাতিচ্যুত হয়ে গেল?

কিন্তু কী তার করবার ছিল? সেই রাত্রি। একটা প্রেতমূর্তির মতো অন্ধকারের ভেতরে চাটার্জি-বাবুর আবির্ভাব। হাওয়ার মতো উড়ে চলেছে মোটর। তার পর সেই ঘর। গোলাপী মদ আর গোলাপী পর্দাটা। সব যেন বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল—নিজের ওপরে এতটুকু কর্তৃত্ব ছিল না। চাটার্জি-বাবুর হাতখানা যাদুকরের মতো ওঠা-নামা করছিল আর সেই সঙ্গে যেন ঘুমের একটা আচ্ছন্ন মাদকতা ছড়িয়ে পড়ছিল রাজেন্দ্রের সমগ্র জাগ্রত বুদ্ধির ওপর দিয়ে। সে যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল—দামী বিলিতী মদের সঙ্গে চাটার্জি-বাবু তাকে কিছু খাইয়ে দিয়েছিল কিনা তাই বা কে জানে।

দরজার ফাঁকে যেখান দিয়ে বাইরের কালো দিগন্তটা দেখা যাচ্ছিল, একটা আকস্মিক ছায়া পড়ল সেখানে। কে এসে দাঁড়িয়েছে। নিঃসাড়ে নিঃশব্দে। রাজেন্দ্র শক্ত হয়ে উঠল: কে?

—চুপ।

রাজেন্দ্রের যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম করল—চাটার্জি-বাবু! হাত-পা যেন তার পক্ষাঘাতের মতো অসাড়—শক্তিহীন হয়ে গেছে।

চাটার্জি-বাবু সাপের শিসের মতো শব্দ করে বললে, ভয় নেই, আমি। কথা আছে।

মূর্তিটা আস্তে আস্তে সরে এল দোর-গোড়া থেকে। দু'হাতে অতি সন্তর্পণে পেছনের দরজাটা দিলে ভেজিয়ে। তার পর নিঃশব্দে এসে বসে পড়ল রাজেন্দ্রের পাশে। গায়ের মধ্যে ছম-ছম করে উঠল—চাটার্জি-বাবু, মিলের অন্যতম ভাগ্যবিধাতা, স্বয়ং ম্যানেজিং ডিরেক্টার যার গলা জড়িয়ে ধরে মোটরে ওঠে—সেই লোক কিনা রাজেন্দ্রের পাশে এসে বসেছে! আর তাদের ভেতরে মাত্র কয়েক ইঞ্চির ব্যবধান! ইচ্ছে করলে রাজেন্দ্র হাত বাড়িয়ে চাটার্জি-বাবুকে স্পর্শ করতে পারে, আর—আর—সেই সঙ্গে গলাটাও টিপে ধরতে পারে না কি!

মাথার দু'পাশে রগগুলো লাফাতে লাগল রাজেন্দ্রের।

চাটার্জি-বাবু ঘাতকের মতো গলায় নিঃসাড়ে জিজ্ঞেস করলে, আর একটা খবর চাই যে।

আতঙ্কে রাজেন্দ্র চুপ করে রইল, কথা বলতে পারল না।

—ধর্মঘটের পাণ্ডা কে কে?

রাজেন্দ্র নীরব।

—কী, কথা বলছ না যে ?

—জানি নে হুজুর।

চাটার্জি-বাবুর অস্পষ্ট হাসি শোনা গেল : আবার সেই পুরোনো চাল ? টাকা চাই ?—না ?

—না।

—তা হলে নামগুলো বলে দাও চটপট। সময় নষ্ট কোরো না।

রাজেন্দ্রের শিরাপেশীগুলো পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল : মাপ করবেন।

—বটে ?—চাটার্জি-বাবু ভূতুড়ে গলায় হেসে উঠলেন : টাকা বেশী চাই বুঝি ?

—এক পয়সাও না। ঢের নেমকহারামী করেছি, আর পারব না।

—সত্যি নাকি ? বেশ। চাটার্জি-বাবু উঠে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে চারটে চোখের আগুনের মতো সোনার বোতামগুলো জ্বলতে লাগল : তা হলে যা করবার আমি করতে পারি তো ?

রাজেন্দ্র তেমনি নীরব হয়ে রইল।

—কাল সারাদিন সময় দিলাম। এর মধ্যে যদি খবরটা না পাই, তা হলে মালিককে আগের খবর কে দিয়েছিল সেটাও চাপা থাকবে না।

দ্রুতগতিতে চাটার্জি-বাবু নেমে গেল—গলির অন্ধকার পথ দিয়ে মিলিয়ে গেল ভৌতিক ছায়ামূর্তি।

রাজেন্দ্র স্থাণুর মতো বসে রইল।

এ কী করল সে—করল কী! রন্ধ্র পথে প্রবেশ করতে দিল শনিকে। পথ নেই আর—মুক্তি নেই। গোলাপী রঙের পর্দা

আর গোলাপী মদ। বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল—নেশার ঝোঁকে কী বলে ফেলেছিল নিজেই জানে না।

নিজের জড়ানো জাল থেকে নিজের আর মুক্তি নেই। এই সবে সুরু। এর পরেও চাটার্জি-বাবু আসবে—বারে বারে ফিরে আসবে—বারে বারে নেমকহারামী করতে হবে তাকে। ওদিকে নিমাই সর্দারের নৃশংস মুখে অমানুষিক নির্মমতা—বয়লারের আগুন গন্ গন্ করে জ্বলে যাচ্ছে। এক মুহূর্তে চাটার্জি-বাবু তাকে বয়লারের মধ্যে ঠেলে দিতে পারে—মাত্র একটি কথায়—একটি ইঙ্গিতে।

—খুন পী লেঙ্গে—তেরা খুন পী লেঙ্গে—

রাজেন্দ্র থর থর করে কাঁপতে লাগল। দুখিয়ার মা চীৎকার করছে—শাসাচ্ছে। কিন্তু কাকে?

মদের বোতলটা তুলে ধরে একসঙ্গে সবটাই সে ঢেলে দিলে গলার ভেতরে। মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল। সে খুন করবে—খুন করবে চাটার্জি-বাবুকে।

—খুন?

একটা অস্বাভাবিক চীৎকার রাজেন্দ্রের গলা থেকে বেরিয়ে অন্ধকার গলির মধ্যে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

মেশিন-ঘরের প্রায়ান্ধকারে বয়লারের সামনে দাঁড়িয়েছিল দুজনে। বাইরে ধর্মঘটীদের কোলাহল। দাবী-পূরণ চাই। এবারে ওরা আর হার মানবে না। জীবন-মরণের সংগ্রাম।

চাটার্জি-বাবু বললেন, নামগুলো এক্ষুণি দরকার। তা হলে চট্‌পট পুলিশে ফোন করে দিতে পারি।

রক্তের ভেতরে গর্জন উঠেছে। চোখে মুখে ঝাঁ ঝাঁ করছে ফুটন্ত রক্তের কণিকা। রাজেন্দ্র বললে, নাম ?

—হ্যাঁ—

রাজেন্দ্রের সতর্ক হাতটা বয়লারের লোহার দরজার হাতলে গিয়ে পড়েছে। একটানে খুলে ফেলই একটা ছোট্ট ধাক্কা। চীৎকার করবারও সময় পাবে না চাটার্জি-বাবু। শুধু চিমনির মুখ দিয়ে কয়লার সঙ্গে পোড়া মাংসের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠবে আকাশে। তারপর—

তারপর ? একটা মুহূর্তে আচ্ছন্ন মনটা যেন বিদ্যুতের চাবুকে চমকে উঠল। সেইখানেই কি শেষ ? ব্যাপারটা চাপা থাকবে না, খুনীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে তাকে। তার পরে আরো আছে। শুধু চাটার্জি-বাবু নয় ; ম্যানেজিং ডিরেক্টার জানে, বাবুরাও হয়তো সবাই জানে। খুনী নয়—বিভীষণও বটে। দাবানলের মত এক মুহূর্তে কথাটা ছড়িয়ে দেবে—ম্যানেজিং ডিরেক্টার প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না। থানাতেও দিতে হবে না তাকে—শুধু কুলিদের মধ্যে তাকে ছেড়ে দিলেই হবে, এক পাল ক্ষুধিত কুকুরের মুখে এক টুকরো মাংস ছুঁড়ে দেওয়ার মতো।

না, না, মুক্তি নেই। শয়তানের শৃঙ্খলে সে বাঁধা পড়েছে। যে পথে সে পা দিয়েছে সে পথ থেকে আর ফিরতে পারবে না—তারই পিছন পথ দিয়ে নেমে চলতে হবে দুর্নিবার গতিতে। একটা অন্যায়কে ঢাকবার জন্য অসংখ্য অন্যায়ের ধারাবাহিক ইতিহাস।

বয়লারের দরজার হাতল থেকে হাতটা ঝুলে পড়ল রাজেন্দ্রের। শুকনো ঠোঁটটাকে চেটে নিয়ে বললে, নাম ? বলছি—

রামায়ণ-বর্ণিত বিভীষণের মৃত্যু নেই। নরকের হাত থেকে বাঁচবার জন্তেই সে দুর্বিষহ জীবনে অমর বর প্রার্থনা করে নিয়েছে।

ব্যাধি

বাবুদের বাড়িতে জন্মাষ্টমীর মেলা। তার সঙ্গে উৎসবের আয়োজন তো আছেই। বাবুরা পরম বৈষ্ণব—এ উপলক্ষ্যে 'দীয়তাং ভুজ্যতাং'-এর সমারোহ পড়ে যাবে তাঁদের বাড়িতে।

মাঝখানে মন্দা পড়ে গিয়েছিল। কয়েকটা বড় বড় মামলার পাপ-চক্রে মালঞ্চের পাল চৌধুরীরা একরকম ডুবে গিয়েছিল বললেই হয়। কোনমতে 'নমো নমো' করে পূর্বপুরুষের ক্রিয়াকর্মগুলো রক্ষা করা হ'ত—শোনা যাচ্ছিল পৈতৃক ভিটেটাও দিন কয়েকের মধ্যেই নীলামে উঠবে।

কিন্তু হাওয়া বদলে গেল। যুদ্ধ বাধল, দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। আর আশ্চর্য, এই একান্ত দুর্বৎসরে যেন কোন্ মন্ত্রবলে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল পাল চৌধুরীরা। নোনা-ধরা দেওয়ালের কলি ফিরল, ভাঙা ঘরবাড়িগুলো নতুন করে গড়ে উঠল আবার। দশ বছর আগে হাতীটাও বিক্রী হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এবারে এল মোটর,—একখানা নয়, দু'খানা। বাবুর বাড়ি আবার পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন। যুদ্ধের বাজারে বাবুরা নাকি জমিদারীর আশা ছেড়ে ব্যবসা ধরেছিলেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়েছে, লক্ষ্মী বর দিয়েছেন।

কলকাতায় লোহার কারবার করেন মেজকর্তা। তিন বছর পরে তিনি দেশে ফিরেছেন—এবারে জাঁকিয়ে জন্মাষ্টমীর উৎসব করতে হবে। টাকার জন্যে পরোয়া নেই। নীলমণিকে স্পষ্টই বললেন, পাঁচ লাখ সাত লাখ টাকার জন্যে তিনি একবিন্দু মাথা ঘামান না। তিনি আজ ধুলোমুঠো ধরলেই তা সোনা হয়ে যাবে।

শুনে নীলমণি রোমাঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

মেজকর্তা গড়গড়ায় টান দিয়ে বললেন, বিশ হাজার টাকা খরচ করব এবার। তাক লাগিয়ে দেব আশপাশের বিশখানা গ্রামকে, সুন্দরগঞ্জের বাঁড়ুয্যেদের। তোমার গাঁয়ের সব লোককে বলে দিয়ো নীলমণি, এখানে এবারে তাদের পাতা পড়বে। আর তুমি—তুমি তো ঘরের লোক, বাড়ির সবাইকে নিয়েই চলে এসো, কী বলো?

চরিতার্থ হয়ে নীলমণি বলেছিল, আজ্ঞে আনব বই কি, নিশ্চয়।

ভাদ্রের ভরা বিল। ধানক্ষেত আর ভুট্টার শীষের ভেতর দিয়ে নৌকো ঠেলে আসবার সময় নীলমণির মনে হয়েছিল কপাল কি এমনি করেই ফেরে মানুষের। তিন বছর আগে এই মেজকর্তাকেই আট হাত ধুতি পরে সুদ্ধু কলমী শাক দিয়ে মোটা লাল বাগড়া ভাত খেতে দেখেছিল সে, এবং সেই রাঙা বাগড়া চালও যে কোথা থেকে আমদানি হয়েছিল সে ইতিহাস নীলমণিই সব চাইতে ভালো করে জানে। সন্ধ্যার অন্ধকারে মেজগিন্নীর নাম লেখা রূপোর বাটিটাকে চাদর ঢাকা দিয়ে সে-ই বিক্রী করে এসেছিল হারাণ মুদীর দোকানে, আর নিরানন্দ নিরালোক বাবুদের বাড়ির ভাঙা

তুলসীমঞ্চটার পাশে দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছিল ঘরের মধ্যে মেজপিসী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

বিলের জলে সন্ধ্যার বাতাস দোলা দিয়েছে। চার দিকে জল দুলে উঠছে, ফুলে উঠছে, ফেনায় ফেনায় ভেঙে পড়ছে সিন্ধু-তরঙ্গের মতো। আর সমস্ত বিল জুড়ে পঞ্চমীর ম্লান অস্তোন্মুখ জ্যোৎস্নায় সেই ফেনা যেন গলিত পুঞ্জ পুঞ্জ রূপোর মতো ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। অন্তহীন জল—সমুদ্রের মতো জল। মাঠ ডুবিয়েছে, পুকুর ডুবিয়েছে, ধানের ক্ষেত—ভুট্টা আর জোয়ারকে তলিয়ে দিয়েছে—ডুবিয়েছে মাঠের ছোট বড় গাছপালার কুঞ্জকে। এত জল কোথা থেকে এল হঠাৎ। শুকনো খটখটে মাঠ দিয়ে নৌকো যেত, পাল্‌কি যেত—পায়ে পায়ে লাগত ধারালো কুশের আঁচড়। কিন্তু তার পরেই দু'দিন দু'রাত টানা বর্ষা—কালো মেঘ থেকে অবিরাম বৃষ্টি। দূরের নদী থেকে ঢালু মাঠের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে জল এল—জল এল কুণ্ডলী করা অসংখ্য কালো কালো অজগর সাপের মতো। দেখতে দেখতে মাঠ হ'ল সমুদ্র। বারো হাত লগি আর থই পায় না—মাথা সুদ্ধ তলিয়ে যায় তার।

মেজকর্তার সঙ্গে এই বিলের কোথায় কী যেন মিল আছে একটা। হঠাৎ জল—হঠাৎ সমুদ্র। তরঙ্গে তরঙ্গে রূপোর ফেনা।

জন্মাষ্টমীর মেলায় আসবার জন্যে বাবু নিজে থেকেই বার বার বলে দিয়েছেন। আসতেই হবে। পাল চৌধুরীদের সঙ্গে সাত-পুরুষের সম্পর্ক—বাবুদের ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলমণি নিজেও তার আন্দোলন অনুভব করেছে। কী আশ্চর্য লোক ছিলেন বড়কর্তা।

নীলমণিকে যেন ছেলের মতো ভালোবাসতেন। সুন্দরগঞ্জের বাঁড়ুয্যেদের সঙ্গে বড় মামলাটায় হারবার খবর পেয়ে আচম্কা মারা গিয়েছিলেন তিনি। ডাক্তার বলেছিল, এতবড় একটা আঘাত হঠাৎ তিনি সহ্য করতে পারেন নি—মাথার শিরা ছিঁড়ে গিয়ে প্রচুর রক্তপাতের ফলে মৃত্যু ঘটেছিল তাঁর। আর নীলমণি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়েছিল, নিজের বাপ মরবার পরেও অমন করে চোখের জল ফেলেনি সে।

মেজকর্তা অবশ্য একটু আলাদা জাতের মানুষ। কথা বলতেন কম, কিছুটা লেখাপড়া জানতেন বলেই হয়তো প্রজাদের সঙ্গে মেশামেশি বা মাখামাখি করতে তাঁর রুচিতে বাধত। কখনো কখনো পুকুরে বসে মাছ ধরতেন, কখনো কখনো কাটাতেন নিজের হাতে তৈরী তাঁর কলমের বাগানে। চোখে সোনার চশমা আর গায়ে গেঞ্জী এই লোকটির সঙ্গে বড়কর্তার অমিলটা বড় বেশি করেই চোখে পড়ত। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি নিয়ে কাঁধে লাল গামছা জড়িয়ে আসর জমিয়ে বসতেন বড়কর্তা। মোটা মানুষ ছিলেন—জামা গায়ে রাখতে পারতেন না। হো হো করে হাসতেন, অকারণে চেঁচিয়ে কথা বলতেন—হাসির ধমকে ভাঁজে ভাঁজে ভুঁড়িটা দোল খেত।

বড়কর্তা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন মেজকর্তা ছিলেন যেন পাহাড়ের আড়ালে। তারপর একদিন সে আড়াল সরে গেল। এতদিন কী করে যে জোড়াতাড়া দিয়ে সংসার চলছিল, বজায় থাকছিল তার ঠাটঠমক—সে রহস্য একমাত্র বড়কর্তারই জানা ছিল। কিন্তু চমক ভেঙে মেজকর্তা দেখলেন অকূল পাথার। চারদিকে দেনা, বাস্তুভিটে যায় যায়। জমিদারী তো দূরের কথা, দু'মুঠো ভাতই এখন জোটানো শক্ত হয়ে উঠেছে।

তারপরে দুঃখের ইতিহাস। মেজগিন্নীর গায়ের সোনাদানা গেল, গেল রুপোর বাসন-কোসন। কলমী শাকের চচ্চড়ি আর রাঙা চালের ভাত সম্বল। কোথায় রইল কলমের বাগান, কোথায় রইল জার্মান হুইল আর সখের বঁড়শি। মেজকর্তার পঞ্চাশ ইঞ্চি ধুতি উঠল হাঁটুর ওপরে।

তারও পরে একদিন মেজকর্তা কলকাতায় চলে গেলেন। ভাগ্যের চাকাটা ঘুরেছে, তিনি গ্রামে ফিরেছেন। এবারে জাঁকিয়ে জন্মাষ্টমীর উৎসব।

নীলমণির মনটা খুশিতে ভরে উঠেছে। বাবুরা উঠুক, আবার দপ্‌দপা ফিরে আসুক মালঞ্চের পাল চৌধুরীদের। নীলমণি প্রকাণ্ড একটা গর্ব অনুভব করছে নিজের মধ্যে। বাবুর বাড়ির সাতপুরুষের চাকর সে—বাবুরা উঠলে তারও উত্থান।

তা ছাড়া আরও একটা আশ্চর্য জিনিসও নীলমণিকে চমৎকৃত করে দিয়েছে। দেশে দুর্ভিক্ষ গেছে—না খেয়ে মরে গেছে মানুষ। কিন্তু বাবুদের সঙ্গে ভাগ্যের একটা অলক্ষ্য সূত্রে যোগাযোগ থাকবার জন্যেই হয়তো এই দুর্দিনেই তারও কপাল ফিরেছে।

সামান্য মহাজনীর কারবার ছিল। সুদে আর বন্ধকীতে যা আসত তাতে দিন চলে যেত। কিন্তু রোজগারের সেই সংকীর্ণ খাতে হঠাৎ যেন জোয়ার নেমে এল তার। নিরুপায় মানুষ নামমাত্র মূল্যে ধানের জমি বিক্রী করতে শুরু করে দিলে। বিলের যে সব ডুবা-জমিতে বর্ষার পরে সোনার মতো ফলন হয়—আট দশ টাকা বিঘা দরে লোকে সে সব জমি ছেড়ে দিলে নীলমণিকে। বিক্রীর প্রথম মরশুমে অতি-লাভের আশায় যারা ক্ষুদ-কুঁড়ো অবধি বিক্রী করে দিয়েছিল, তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ল শেষ পর্যন্ত জমি বিক্রী

করে। আগে ছিল কুড়ি বিঘা—এখন নীলমণি একশো বিঘা ধানী-জমির একচ্ছত্র মালিক।

দৈব—দৈব ছাড়া আর কী? মেজকর্তার ধুলোমুঠো সোনা হ'ল—নীলমণির কুড়ি বিঘে হ'ল একশো। হঠাৎ নীলমণির মনে হ'ল বাবুদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা শুধু সাতপুরুষের নয়—একেবারে জন্ম-জন্মান্তরের। অকারণেই মেজকর্তার ওপরে তার শ্রদ্ধাটা বেড়ে গেল দ্বিগুণ। বাবুদের যত বাড়বে—তারও যেন সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলবে—সম্পর্কটা একেবারে অঙ্গাঙ্গী।

সুতরাং জন্মাষ্টমীর উৎসবে যাওয়ার আহ্বানে নীলমণি উৎসাহিত হয়ে উঠল।

বৌ কিছুদিন থেকে নানা জাতের অসুখে ভুগছে, বিছানা ছেড়ে নড়তে পারে না। ছেলেটাও ভুগছে ম্যালেরিয়ায়। অথচ মেজকর্তা বলেছেন, নীলমণি, সবাইকে নিয়ে এসো, এ তো তোমার ঘরেরই কাজ—

নীলমণির রাগ হয়ে গেল। বৌ কেন এভাবে পড়ে আছে বিছানায়, কেন অন্তত আজকের দিনটাতে সে মাথা তুলে উঠে বসতে পারে না, কেন খুশিতে ঝলমলে হয়ে যোগ দিতে পারে না বাবুর বাড়ির আনন্দোৎসবে? একটা প্রকাণ্ড ছন্দপতনের মতো বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে সে—অসুখেরও কি দিনক্ষণ থাকতে নেই একটা?

বিছানার মধ্যে শুয়ে শুয়েই বৌ নীলমণির উষ্মাটা অনুভব করতে পারে।

—অমন করে চেঁচিয়ে মরছ কেন?

—চ্যাঁচাব না! বাবু কত করে বলেছেন সবাইকে নিয়ে যেতে, অথচ তুই দিব্যি বিছানায় পড়ে রইলি।

—কি করব বলো। মরতে মরতে তো আর যেতে পারি না।

—দরকার হলে মরতে মরতেও যেতে হয়।

গজগজ করতে করতে বেরিয়ে এল নীলমণি। ছোটমেয়েটা সামনে এসে পড়েছে, নাকি স্বুরে বললে, বাবা, আমি বাবুদের বাড়িতে যাবো কিন্তু—

নীলমণি নিরুত্তরে তার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলে।

শেষ পর্যন্ত ছোট মেয়েটাকে নিয়েই নীলমণি রওনা হ'ল বাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে।

দেখতে দেখতে খাল পেরিয়ে নৌকো বিলে এসে নামল। আদিগন্ত শাদায় এবং শ্যামলে একখানা বিরাট চিত্রপট। জল দুলছে, জল ফুলছে, রূপোর ফেনা ছড়িয়ে নেচে উঠছে খুশিতে—খেয়ালে। তার মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত। শাদা জলের ওপর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে শ্যামল শস্য। বিলের প্রাণরসে পরিপূর্ণ হচ্ছে বঙ্গলক্ষ্মীর সোনার ঝাঁপি।

আধোজাগা ধানের শীষ থেকে—ভুট্টার আগা থেকে উড়ে আসছে বড় বড় ফড়িং। ছোট মেয়েটা দু'হাতে ফড়িং ধরবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল।

হঠাৎ লগিতে জোরে একটা খোঁচ দিলে নীলমণি।

—কেমন ধান হয়েছে রে পুঁটি ?

—ভালো ধান বাবা—ফড়িংয়ের দিকে মনোযোগ রেখেই পুঁটি জবাব দিলে।

—আমার ধান, বুঝলি ?—'আমার' কথাটার ওপর অস্বাভাবিক

একটা জোর পড়ল। কুড়ি বিঘে থেকে একশো বিঘেয় পদার্পণের আনন্দটা নীলমণির কণ্ঠ থেকে উছলে উঠল যেন : সব আমার ধান। ওই সামনে—ওই চকের ধারে, যত দেখতে পাচ্ছিস, সব আমার।

—সব তোমার? পুঁটি চোখ বড় বড় করলে।

—সব আমার। এবার ঘরে আমার লক্ষ্মী পা দেবেন। তোকে সোনার মাকড়ি গড়িয়ে দেব, কেমন?

পুঁটি এতক্ষণে বড় একটা লাল ফড়িংকে ছোট ছোট হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলেছে। ফর ফর করে শব্দ করছে সেটা, পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। পুঁটি বললে, আর সোনার বালা?

—সোনার বালা!

নীলমণি হো হো করে হেসে উঠল। পুঁটি ছোট হলেও বোকা নয় —বুদ্ধিশুদ্ধি তার আছে। মাকড়িতে কতটুকু সোনা থাকে আর! এক জোড়া সোনার বালার দাম যে অনেক বেশী সেটা সে এর মধ্যেই বুঝে নিয়েছে। শুধু দু'টুকরো মাকড়ি দিয়েই তাকে ভুলিয়ে দেওয়া যাবে না।

নীলমণি প্রসন্ন গলায় বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, সোনার বালাও দেব। কৃষ্ণের ইচ্ছায় এবারেও যদি ধানের দরটা চড়ে যায়—

একশো বিঘে জমির ঘনশ্যামল ধানের দিকে নীলমণি তাকালো। হঠাৎ নিজেকে মনে হ'ল সম্রাট—মনে হ'ল কী বিরাট ঐশ্বর্যের অধিস্বামী। সামনে যতদূরে তাকাও—তার ধান, তার শস্য, তার রাজকর। এই তো সূত্রপাত। সামনে এখনো দিন পড়ে আছে—পড়ে আছে যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত নীলমণি কোথায় গিয়ে যে পৌঁছবে কে বলতে পারে? তারপর একদিন—হয়তো পাঁচ বছর, হয়তো বা সাত বছর পরে একদিন—সেও মেজকর্তার মতো বড় হয়ে উঠবে—

সেও একদিন জন্মাষ্টমীর উৎসবে দশখানা গ্রামকে নিমন্ত্রণ করতে পারবে—

শুধু একটা সমস্যা। সাত বছর ধরে যদি এমনি আকাল চলতে থাকে, তা'হলে নিমন্ত্রণ খাবার জন্যে মানুষ বেঁচে থাকবে তো? নইলে জন্মাষ্টমীর উৎসবটা জমে উঠবে কাদের নিয়ে? অথচ গত বছরের অভিজ্ঞতায় যা তার চোখে পড়েছে—

—ওই যাঃ, ফড়িংটা উড়ে গেল বাবা।

নীলমণি যেন আত্মস্থ হয়ে উঠল হঠাৎ। নৌকোটা ধানক্ষেতের মাঝখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে—বাতাসে চারিদিকে শিরশির করছে সরস শীষ। এই ক্ষেত আগে ছিল কাসেম ফকিরের—মহাজনীর প্যাঁচে নীলমণি এবারে আত্মসাৎ করেছে এটা। কোথা থেকে দমকা একটা বাতাস এল—ধানের বনের শিরশির শব্দটাকে ছাপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেজে উঠল যেন। মনে হ'ল কাসেম ফকির অভিশাপ দিচ্ছে।—জমিটা তুমি নিলে সরকার মশাই, কিন্তু ছেলেপুলেগুলো না খেয়ে মরে যাবে—

মনের প্রসন্নতাটা যেন মেঘের ছায়ায় কালো হয়ে গেছে। এমন জোরে লগিতে খোঁচা দিলে নীলমণি যে নৌকোটা প্রায় লাফিয়ে ছিটকে এল তিন হাত। অনেক দূরে কোথা থেকে বাজনার শব্দ—নিশ্চয় মেজকর্তার বাড়িতে। ক্ষণিকের দ্বিধাগ্রস্ত মনটা হঠাৎ যেন আশ্রয় পেল, আশ্বাস পেল।

—বাবা, ফড়িংটা পালিয়ে গেল—

—পালাক—রূঢ়কণ্ঠে জবাব দিয়ে নীলমণি লগি উঠিয়ে বোটে ধরলে। ক্ষেত ছাড়িয়ে এবার গভীর বিল। থই থই শাদা জল—বোটের টানে নৌকো তর্‌তরিয়ে এগিয়ে চলল। আর দূরে পেছনে

বিকালের হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল কাসেম ফকিরের ধানের ক্ষেত।

বাবুর বাড়িতে পা দিয়েই নীলমণির তো চক্ষুস্থির।

হাঁ—আয়োজন যদি করতে হয়, তা'হলে এমনি করেই। বাড়ির সামনেকার মাঠটায় প্রকাণ্ড মেলা বসে গিয়েছে। বেলুন উড়ছে, ভেঁপু বাজছে, নাগরদোলা ঘুরে চলেছে। পোড়া তেলের কড়া গন্ধ ছড়িয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কড়াতে ভাজা হচ্ছে বেগুনী, নিম্‌কি, জিলিপি। মাটির পাখী, কাঠের ঘোড়া। পুঁতির মালা, কাঁচের চুড়ি, মেটে সাবান; তাঁতের শাড়ী, রঙিন তোয়ালে। টিনের বাক্সে জার্মান বায়োস্কোপ:

"দেখো দেখো যুদ্ধ হৈল, কত মানুষ মরে গেল,
সাহেব বিবি চলে আইল—তামাসা লেও এক পইসা—"

পুঁটি আর চলতে চায় না।

—বাবা, পাখী কিনব—

—দু' পয়সার তেলে ভাজা বাবা—

নীলমণি বললে, চল, চল। আগে বাবুর সঙ্গে দেখা করি, প্রসাদ পাই ঠাকুরের, তবে না?

ঠাকুরবাড়িতে আরো বেশী ভিড়। আগে যখন নীলমণি দেখেছিল তখন রাধাশ্যামের আঙিনা জরাজীর্ণ। মন্দিরের দেওয়াল ফেটে গিয়েছে—ছাদ দিয়ে বর্ষার জল চুঁইয়ে পড়ে দেওয়ালের গায়ে গায়ে এঁকে দিয়েছে শ্যামল সরীসৃপ-চিহ্ন। কার্নিশে কার্নিশে আশ্রয় নিয়েছে পারাবতের সংসার—কলকূজন আর আবর্জনায় তারা

অত বড় মন্দিরটাকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। ঠাকুরের 'শীতল' হয় নামে মাত্র—শুধু এক-একটা ক্ষীণ শঙ্খধ্বনি মন্দিরের ফাটলে ফাটলে অতীতের গোঙানির মতো মূছিত হয়ে পড়ে।

কতবার দেবালয়ের এই শ্মশানে প্রণাম করে গেছে নীলমণি। চোখে জল এসেছে মন্দিরের এই অবস্থা দেখে। অথচ বড়কর্তার আমলে কত সমারোহ ছিল এর, কত প্রাণ ছিল। সেদিনের শঙ্খগুলো ধুলো হয়ে ঝরে-পড়া বালি আর কাঁকরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, বড় বড় ঘণ্টাগুলো ভেঙে মরচে ধরে ছড়িয়ে আছে আনাচে কানাচে, ইঁদুরে কেটে নিয়েছে চামর ছত্র—ঠাকুরের গায়ের সোনাদানা অবধি বিক্রী হয়ে গেছে দেনায়।

কিন্তু আজ? আজ যেন চোখকে বিশ্বাস হয় না। বড়কর্তা বেঁচে থাকলে তিনিও বিশ্বাস করতে পারতেন কিনা বলা শক্ত। মন্দির আগে যা ছিল—তার শতগুণে উন্নতি লাভ করেছে। রাধাকৃষ্ণের গায়ে ঝলমল করছে জড়োয়ার গয়না। শুভ্র চামরের আন্দোলনে, ধূপ-ধুনো-গুগ্‌গুলের গন্ধে, রাশি রাশি ফুলে আরতি হচ্ছে ঠাকুরের। থালায় থালায় বহুমূল্য ভোগ বেড়ে দেওয়া হয়েছে—এই দুর্বৎসরে কোথা থেকে এত সব যোগাড় করলেন মেজকর্তা?

নাট-মন্দিরে নাম-সংকীর্তন চলছে বৈষ্ণবদের। খোল আর করতালের সঙ্গে সঙ্গে উঠছে নাম-কীর্তন। পদাবলীর মাধুর্য উচ্ছলিত হয়ে পড়ছে ভক্তের আবেশ-বিহ্বল কণ্ঠস্বরে :

'হেরিলাম নবদ্বীপে সোনার গৌরাঙ্গ,
দেহ-মনে উছলিল প্রেমের তরঙ্গ—'

নীলমণি বললে, প্রণাম কর পুঁটি, প্রণাম কর। জয় রাধেকৃষ্ণ—

বিচলিত হয়ে মন্দিরের মার্বেল বাঁধানো রোয়াকে প্রণাম করলে পুঁটি। যতটা ভক্তিতে নয়, তার চাইতে অনেক বেশী বিস্ময়ে এবং ভয়ে। আর গলবস্ত্র হয়ে সেই জনতারণ্যের মাঝখানে মুদিত-চোখে দাঁড়িয়ে রইল নীলমণি।

'এসো হে গৌরাঙ্গ আমার সংকীর্তন মাঝে—'

ধূপ-ধুনো—বত্রিশটা ঝাড়লণ্ঠনের আলো। জড়োয়ার গহনা থেকে রাধাকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ দিয়ে যেন ঠিকরে পড়ছে। আবেশ-বিহ্বল নীলমণি যেন স্বপ্নের চোখে দেখতে লাগল : বৃন্দাবন-লীলায় আবার নতুন করে রাধাকৃষ্ণ ফিরে এসেছেন, আর ভাবে বিভোর সোনার গৌরাঙ্গ নাচতে নাচতে নবদ্বীপের কঠিন মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন।

—জয় রাধেকৃষ্ণ—

হঠাৎ চমক ভেঙে গেল নীলমণির। চরণামৃতের পাত্র হাতে স্বয়ং মেজকর্তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—চরণামৃত?

জনতা একের পর এক ব্যগ্র ব্যাকুল হাত বাড়াতে লাগল, আর নীলমণি আশ্চর্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মেজকর্তার দিকে। সর্বাঙ্গে চন্দন সেবা করেছেন তিনি, গরদের ধুতিতে কী চমৎকার মানিয়েছে তাঁকে। সত্যিকারের বৈষ্ণব মেজকর্তা—সত্যিকারের ভক্ত।

চরণামৃতের পাত্র এগিয়ে এল। আরো দশজনের সঙ্গে হাত বাড়ালো নীলমণি, তুলে ধরলে পুঁটির ছোট হাতখানা। ভিড়ের মধ্যে মেজকর্তা নীলমণিকে চিনতে পারলেন না।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই বত্রিশ ডালের ঝাড়-লণ্ঠনের আলো মেজকর্তার হাতের ওপরে এসে পড়ল। নীলমণি যা দেখল তা যেন

বিশ্বাস করবার মতো নয়। মেজকর্তার হাতের পিঠে একটা শাদা উজ্জ্বল দাগ—তার ভেতরে রক্তের আভা। নিঃসন্দেহে কুষ্ঠ। অথচ বড়কর্তার হাত—সে হাত ছিল অম্লান, চাঁদের মতো নিষ্কলঙ্ক।

মুখে মাথায় দিতে গিয়ে চরণামৃত নীলমণির পায়ে পড়ে গেল। ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় কুষ্ঠের অনিবার্য নিঃসন্দেহ দাগটা পাঁচটা সোনার আংটির চাইতে বেশী জ্বলজ্বল করছে। নীলমণি শুনেছিল, বেশী সোনারূপো ঘাঁটলে নাকি হাতে কুষ্ঠ হয় মানুষের।

রাত্রের বিলের মধ্য দিয়ে নীলমণির নৌকো চলছিল।

পুঁটি একপাশে ছোট আর ঘন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—চারপাশে ছড়ানো রয়েছে তার খেলনাগুলো। অন্ধকার ধানবনের ভেতর দিয়ে নৌকো চলেছে নীলমণির।

নির্জন—নিস্তব্ধ পৃথিবী। চাঁদ ডুবে যাওয়া কালো আকাশ, শুধু তারার একটা তরল আলো জলের ভেতর থেকে প্রতিফলিত হয়ে পড়ছে। কোনোখানে জনমানবের সাড়া-শব্দ নেই, শুধু নীলমণির নৌকোর লগি পড়ছে : ছপ্—ছপ্—ছপ্—

কাসেম ফকিরের ধানবন। শিরশিরে বাতাস—ধানের শীষে শীষে যেন অশরীরী কান্না। লগির ঘষায় নীলমণির বুড়ো আঙুলের নীচে খচ খচ করে জ্বালা করছে।

হঠাৎ নীলমণির যেন চমক লাগল। যে জায়গাটার ছাল ছড়ে গিয়েছে—সেখানে শাদা মতোন ওটা কিসের দাগ দেখা যাচ্ছে—চকচক করে উঠছে তারার আলোয়। ঝাড়-লণ্ঠনের তীব্র শিখায় মেজকর্তার হাতে সে যা দেখেছিল,—এ কি তাই? কুষ্ঠ?

একটি চলচ্চিত্রের ভূমিকা

নিত্যানন্দ চৌধুরী কাঁদছিলেন। দেখলে বিশ্বাস হয় না কিন্তু সত্যিই কাঁদছিলেন। মেদস্ফীত গালের ওপর দিয়ে একটির পর একটি জলের ফোঁটা এসে টপটপ করে টেবিলের ওপরে পড়ছিল।

আর আমি বসে ছিলাম নির্বোধের মতো। বলবার মতো কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি যে এখান থেকে উঠে পালাতে না পারলে রক্ষা নাই। কিন্তু আমি জানি তার কোনো উপায় নেই, নিত্যানন্দ চৌধুরী আমাকে কিছুতেই ছাড়বেন না। আমার প্রতি একটা অমানুষিক ভক্তির আবেগ তাঁর মনে দুর্বার হয়ে উঠেছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেও তাঁর ভক্তদের চোখ দিয়ে এমন করে গলদশ্রু ঝরত কিনা সন্দেহ।

নিত্যানন্দ চৌধুরী বললেন, বলব কি মশাই, যেদিন প্রথম আপনার লেখা পড়লাম, সেদিনই মনে হল যেন তার ভেতর দিয়ে আমার প্রাণের কথা শুনতে পাচ্ছি। কী যে ইচ্ছে হয়েছিল, ভেবেছিলাম ছুটে গিয়ে একেবারে আপনার পা জড়িয়ে ধরব। বলব, স্যার, আপনি শাপভ্রষ্ট দেবতা, নইলে এমন করে আমার প্রাণের ব্যথাটা বুঝলেন কী করে!

আমি চকিত হয়ে পা দুটো নিজের চেয়ারের নীচে টেনে নিলাম। কিছু বিশ্বাস নেই। ভাবসমুদ্রের তরঙ্গে ভদ্রলোকের সুডোল বপুটি যেভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে, তাতে যে-কোন মুহূর্তে একটা কেলেঙ্কারি করে বসা অসম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

অবশ্য কারণ ছিল। আমার সামনে বসেই ইতিমধ্যে গোটা

চারেক পেগ উদরস্থ করেছেন। এর মধ্যেই দশম দশার নানা বিবর্তন দেখতে পাচ্ছিলাম। প্রথমটা পেটে পড়তে বেশ খুশি হয়ে উঠলেন, প্রাণ খুলে রসিকতা আরম্ভ করলেন; দ্বিতীয় পেগ তাঁকে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত করে তুলল, মনে হল এখন যে-কোনো মুহূর্তে তিনি যুদ্ধে যেতে পারেন; তৃতীয় পাত্র তাঁকে হঠাৎ বিষণ্ণ দার্শনিকে রূপান্তরিত করল, যেন এই মায়াময় জগতটার বিরাট ফাঁকিবাজি তিনি উপলব্ধি করে ফেলেছেন, তারপর চতুর্থ পাত্রে এই কাণ্ড। ভাব-বৈচিত্র্য যদি এই নিয়মে চলতে থাকে তাহলে শেষ দশা অর্থাৎ পতন ও মূর্ছা যে দশম পেগের আগেই এসে পড়বে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রথমে আমাকে যথেষ্ট সাধাসাধি করেছিলেন, তারপরে নিদারুণ বিস্মিত হয়ে গেলেন: সেকি মশাই, আপনি গল্প লেখেন, আপনি সাহিত্যিক, অথচ একেবারে নিরামিষ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একেবারে কিছুই খাবেন না? তা হলে একটু জিন? জিঞ্জার দিয়ে খান, দিব্বি গোলাপী আমেজ আসবে, মুখে একটুও গন্ধ থাকবে না।

—আজ্ঞে না।

—তাহলে সুইট ভারমুথ? সেরা জিনিস মশাই, অ্যালকোহল নেই বললেই চলে—

আমি ক্রমশ ভীত হয়ে উঠছিলাম। নিতান্ত কুক্ষণেই আজ ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়েছি। অপরাধের মধ্যে একটা সাহিত্য বাসরে গিয়েছিলাম, সেইখানেই নিত্যানন্দবাবুর সঙ্গে আলাপ। তারপর যেই বেরিয়েছি, অমনি ভদ্রলোক সঙ্গ ধরলেন। বললেন, শ্যামবাজারে যাবেন তো? চলুন আমিও যাচ্ছি।

বাসে উঠতে যাচ্ছিলাম, নিত্যানন্দবাবু উঠতে দিলেন না। ট্যাক্সি ডাকলেন একটা। বললেন, যা ভিড় বাসে, যুদ্ধের জন্যে ওতে কি আর ভদ্রলোকে উঠতে পারে মশাই! একটু আরাম করে যাওয়া যাক চলুন।

অগত্যা। বলাবাহুল্য, পাটভাঙা সিল্কের পাঞ্জাবি আর মিহি ফরাসডাঙ্গার ধুতিপরা এমন একটি গোলগাল ভক্তকে নেহাৎ মন্দ লাগছিল না। ভারী বিনয়ী আর অতিরিক্ত সদালাপী। সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণা নেই বটে, কিন্তু অনুরাগ আছে। তা ছাড়া বেশ ধর্মপ্রাণ, কালীঘাট দিয়ে আসবার সময় কালী-মন্দিরের উদ্দেশ্যে একটা প্রণামও করলেন দেখলাম।

মোটর চৌরঙ্গীর কাছাকাছি আসতে বললেন, ভারী খিদে পেয়েছে, কিছু খেয়ে নিলে হত না?

আপত্তি ছিল না। সাহিত্য সভায় ঘণ্টা তিনেক অসহ্য আলোচনা শোনবার পরে এক কাপ চায়ে মজুরি পোষায়নি, বরং ক্ষিদেটা পেটের ভেতর বেশ তীব্র ভাবে জানান দিচ্ছিল। নিত্যানন্দবাবু কৃতকৃতার্থ হয়ে গেলেন, আমার মনে হল বৈষ্ণবী বিনয়ের দিক থেকে তাঁর বৈষ্ণব নামটা পুরোপুরি সার্থক।

মোটর কিন্তু চৌরঙ্গীর কোনো হোটেলে ভিড়ল না। তীরের মতো চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট্ দিয়ে, তারপর থামল এসে চীনে পাড়ার ভেতরে। এবং ছোট একটা গলি আর পচা চামড়ার উৎকট গন্ধ পার হয়ে আমরা একটা চীনে হোটেলে ঢুকে পড়লাম।

বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ভেতরে একেবারে জমজমাট কারবার। আয়োজন-উপকরণের অভাব নেই বিন্দুমাত্র। একটা কেবিনে ঢুকে দুজনে আসন নিলাম এবং তখন থেকেই এই পর্ব চলছে।

অন্তত একটা পেগ্ খাওয়ার জন্যও প্রচুর সাধ্য-সাধনা করে অগত্যা নিত্যানন্দবাবু নিজেই লেগে গেলেন, তারপরে আমার কথা আর তাঁর মনে রইল না। আর আমিও সেই থেকে এক গ্লাশ ভিমটো আর একটা ফাউল কাটলেট্ নিয়ে বসে আছি, নিত্যানন্দবাবুর লীলা-বৈচিত্র্য আমাকে যেন অভিভূত করে ফেলেছে।

—হ্যাঁ দেখুন,—পঞ্চ পেগের হুকুম দিয়ে নিত্যানন্দবাবু বাষ্পাবিল গলায় বলতে লাগলেন: আপনার লেখার সঙ্গে আমার মনের সম্পূর্ণ মিল আছে। আপনার লেখার ভেতরে আপনি বড়লোকদের তীব্র ভাষায় গাল দিয়েছেন। ঠিক করেছেন, দেওয়াই উচিত। একবার আধবার নয়—হাজার বার।

উত্তেজিত হয়ে উঠতে গিয়েও নিত্যানন্দবাবু পারলেন না, শুধু চর্বিতে চকচকে গোলাপী গাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের জল তেমনি গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আমি বললাম, ধন্যবাদ।

—ধন্যবাদ! ধন্যবাদ মানে?—তীব্রস্বরে বলতে গিয়ে নিত্যানন্দ বাবু অস্বাভাবিক বিকৃত গলায় ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন: আপনি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন কি স্যার, সমস্ত দেশের উচিত আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া। মশাই, আমি জানি দেশে গণ-বিপ্লব আসছে, আসছে নতুন যুগ, আর আপনারা হচ্ছেন সেই বিপ্লবের অগ্রদূত—পায়োনিয়ার। রুশো, ভল্টেয়ার, কার্ল মার্কস্, গোর্কী—একটু থেমে গিয়ে নিত্যানন্দবাবু বললেন, আরো কে কে আছে বলুন দেখি?

বল্লাম, অনেকেই আছেন, কিন্তু তাঁদের কথা থাক। এবার ওঠা যাক নিত্যানন্দবাবু, বিস্তর রাত হয়ে গেছে।

—উঠবেন! সেকি!—যেন আকাশের জ্যোতির্ময় স্বপ্নলোক থেকে হঠাৎ কঠিন মাটিতে নিত্যানন্দবাবু আছড়ে পড়লেন: উঠবেন কী রকম! আমার গোপন কথাটাই যে আপনাকে বলা হয়নি স্যার। সে কথা আপনাকে না বললে আমি কিছুতেই শান্তি পাবো না, আমাকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে চলে যাবেন না।—

কান্নার সঙ্গে সঙ্গে এবারে তাঁর হেঁচকি উঠতে লাগল।

আচ্ছা মাতালের পাল্লায় পড়েছি যা হোক। চীনে পাড়ায় এই অপরিচিত হোটেলের ওপর দিয়ে রাত ক্রমশ গভীর হয়ে আসছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা ছায়ার মতো মনের ওপর দিয়ে বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে। ওখানে একটা কেবিনে জড়িত ইয়াঙ্কী টানে একটা দুর্বোধ্য আসুরিক রাগিণী শুনতে পাচ্ছি। কোথায় যেন তরল গলায় কে খিল খিল করে হেসে উঠল, ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ল একটা গ্লাশ। এখানে আমি যেমন বেমানান, তেমনি বিপন্ন।

নিত্যানন্দবাবু বললেন, ভাবছেন কেন, এ কলকাতা শহর। ট্যাক্সি করে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। আর একটু বসুন দাদা, সঙ্গ দিয়ে ধন্য করুন।

দাদা! অন্তরঙ্গতার জালটা ক্রমশ বেশী করে জড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ফাঁসে আটকে না যাই আপাতত সেইটেই দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিজেকে ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিলাম। অসহায় গলায় বললাম, কী বলবেন বলুন।

ততক্ষণে পঞ্চম পেগ এসে পৌঁছেছে। ছোট্ট করে একটা চুমুক দিলেন নিত্যানন্দবাবু। বিধ্বস্ত গলায় বললেন, জানেন মশাই, আমিও আপনাদের দলে।

—সত্যি নাকি ?

—নিশ্চয়—টেবিলে একটা সজোর মুষ্ট্যাঘাত পড়ল : না, না, সাহিত্যচর্চা আমি করি না। ওসব কি আর আমাদের পোষায় মশাই ? তবে আমিও চাই গরীবের দুঃখ ঘোচাতে, বড় লোকের অত্যাচার দূর করতে।—নিত্যানন্দবাবুর মুখে রেখাগুলো সংকল্পের দৃঢ়তায় কঠোর হয়ে উঠল।

ফ্যানের বাতাসে তাঁর শ্যাম্পু করা চুলগুলো উড়তে লাগল, উড়তে লাগল দামী সিল্কের পাঞ্জাবি। দুহাতের হীরের আংটি চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল আমার। ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় জামা আর আস্তিনের বোতামগুলো ঝক ঝক করতে লাগল—ওগুলোতেও কি নিত্যানন্দবাবু হীরে বসিয়ে নিয়েছেন নাকি ? চোখে দামী বিলিতী মদের নেশা স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলছে, দরিদ্রের দুঃখহরণ মূর্তিই-বটে।

আমি বললাম, সাধু সংকল্প !

প্রখর থেকে প্রখরতর হয়ে উঠল নিত্যানন্দবাবুর চোখ-মুখ। গালের তৈলাক্ত পিণ্ড দুটো কঠিন আর সংক্ষিপ্ত হয়ে আসতে লাগল। ঈজিপ্সিয়ান সিগারেটের টিন থেকে একটা বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি : বস্তি দেখেছেন কখনো ?

বললাম, দেখেছি।

—কী দেখেছেন ? কতটুকু দেখেছেন ?—ঈজিপ্সিয়ান সিগারেটের ধোঁয়া রিং করতে করতে নিত্যানন্দবাবু বললেন, আপনাদের চাইতে ঢের বেশী দেখেছি আমি, মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছি, সেখানে কত দুঃখ, কত লাঞ্ছনার ভেতরে মানুষ দিন কাটায়।

—বটে !

এবারে আমার আশ্চর্য হওয়ার পালা।

—হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন। জানেন, টালীগঞ্জে আমার নিজেরই একটা বস্তি ছিল! আমি বহুবার সেখানে গেছি মশায়। দেখেছি গরু-ভেড়ার মতো সেখানে কেমন করে লোকে দিন কাটায়। কাদা, নোংরামি, ভাঙা ঘর। দু'মিনিট সেখানে দাঁড়ালে দম বন্ধ হয়ে আসে। অথচ সেখানে বাস করে কারা জানেন?

—আপনিই বলুন।

—জানেন কারা বাস করে? তারা আপনার আমার মতো ভদ্রলোক নয়—ভালো জামা-কাপড় পরতে পায় না। অথচ তারাই হচ্ছে সভ্যতার বনিয়াদ, তারাই হচ্ছে কলকাতার প্রাণ। তারা আমাদের মুখে অন্ন জোগায়, কিন্তু তাদের অন্ন জোটে না; তারা আমাদের জন্যে আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি তৈরী করে দেয়, অথচ তাদের থাকবার জন্যে ভাঙা ঝোপড়ী!

কথার তোড়ে নিত্যানন্দবাবুর দু' কশে ফেনা দেখা দিল, আর আমি চমকে উঠলাম। কার মুখে কী শুনছি? তবে কি এতক্ষণ ভুল বুঝেছিলাম আমি? দৈত্যকুলে ছদ্মবেশী প্রহ্লাদকে চিনতে পারিনি? ওই সিল্কের জামা, ফরাস ডাঙার ধুতি, হীরের আংটি, চুলের শ্যাম্পু, এগুলো কি সব নিতান্তই মরীচিকা?

মনের মধ্যে সোডার ফেনার মতো শ্রদ্ধার আকস্মিক উচ্ছ্বাস বিজ-বিজ করে উঠল। আমি ভিমটোর গ্লাসে চুমুক দিতে ভুলে গেলাম, নির্নিমেষ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম নিত্যানন্দবাবুর মুখের দিকে।

—বিশ্বাস করুন,—কী আত্মগ্লানি বোধ করলাম আমি!—নিত্যানন্দবাবু বলে চললেন: এ অন্যায়, নিতান্ত অন্যায়। এর প্রতিবিধান করতে হবে, যেমন করে হোক এর একটা ব্যবস্থা করতেই

হবে। বলব কি মশাই ভাবতে ভাবতে আমার আহার-নিদ্রা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

আমি মুগ্ধচিত্তে শুনে যেতে লাগলাম। সত্যিই একটা শিক্ষা হয়ে গেল আজকে। মানুষকে কত সহজে ভুল বুঝি আমরা। এই নিত্যানন্দবাবু সম্বন্ধেই না কত আবোল-তাবোল ধারণা এতক্ষণ আমার ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছিল!

—আপনি নিশ্চয় বস্তির উন্নতি করে দিলেন?

—বস্তির উন্নতি! নিত্যানন্দবাবু সবেগে আবার কেঁদে ফেললেন: একথা আপনিও বললেন স্যার? বস্তির উন্নতি! বস্তি কেন থাকবে বলতে পারেন? কেন মানুষ এমন করে অপমান সহ্য করবে? যেদিন দেশ থেকে আমরা বস্তিকে একেবারে তুলে দিতে পারব, বুঝব সেদিনই দেশে সত্যিকারের স্বাধীনতা এসেছে।

আমার চমক লাগল: হ্যাঁ, আপনি খাঁটি কথাই বলেছেন।

—বাজে কথা আমি বলি না মশাই। যা বলি, অনেক ভেবেই বলি। দেখুন, পুঁথি পড়ে কথা শেখবার অভ্যাস আমার নেই। নিজের চোখে যতটুকু দেখি, যতটুকু বুঝতে পারি, তাই আমার সঞ্চয়।

আমি শুধু বলতে পারলাম: চমৎকার।

রুমালটা চোখের জলে অনেক আগেই ভিজে সাঁৎসেঁতে হয়ে গেছে, এবার জামার হাতায় চোখ মুছতে লাগলেন নিত্যানন্দবাবু: সত্যি ভারী কোমল মন আমার। এসব অত্যাচার অবিচার আমাকে বড় কষ্ট দেয়, বুঝলেন! তাই যারা এর প্রতিবাদ করে তাদের ভারী শ্রদ্ধা করি আমি। সেইজন্যই তো বলছিলাম, আপনি আমার প্রাণের কথা একেবারে আঁচড়ে বের করে ফেলেছেন—আপনি আমার নমস্য।

কান্না বন্ধ করে নিত্যানন্দবাবু এবার শিবের মতো ধ্যানগম্ভীর হয়ে বসলেন। খুব সম্ভব পঞ্চম পেগের ফল। চোখ দুটোও ধুত্‌রোয় বিহ্বল মহাদেবের মতোই ঢুলু ঢুলু হয়ে এসেছে। আর আমারও যেন কেমন ঘোর লাগছে। প্রাণেই অর্ধভোজনের ফল হয়েছে নাকি? ঝাঁঝালো হুইস্কির গন্ধ স্নায়ুর মধ্যে ঢুকে কি আমাকেও অবশ আর অচৈতন্য করে ফেলেছে?

রাত বাড়ছে—চীনে-পাড়ার এই নিরিবিলি হোটেলটার উপর দিয়ে নামছে বিচিত্র মাদকতা। যারা কথা বলছে, তাদের প্রত্যেকের কথাই জড়ানো—ইংরাজী-বাংলা—হিন্দী-উর্দু-চীনে ভাষায় মিলিত কলগুঞ্জন বাজছে। নিত্যানন্দবাবুর গ্লাশে উজ্জ্বল সোনালী পানীয় টলটল করছে, আর বেশ কাব্যমণ্ডিত ভাষায় তিনি শোনাচ্ছেন নিপীড়িত মানবের বাণী। মনে হতে লাগল নিত্যানন্দবাবুর সঙ্গে আমার এই যে আকস্মিক পরিচয়, এ একটা মস্ত বড়ো সৌভাগ্য ছাড়া আর কী!

কয়েকটা ঘোর লাগা মুহূর্ত কেটে গেল। বললাম, হাঁ, আপনার বস্তির কথা কী বলছিলেন?

—আহা, সেই জন্যেই তো আপনাকে আটকে রাখছি—ঈজিপ্সিয়ান সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে নিত্যানন্দবাবু বললেন: আপনার একটু সহায়তা চাই, স্যার।

—সহায়তা চাই? কী সহায়তা?

—মানে—নিত্যানন্দবাবু বললেন: আপনাকে সেজন্য যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

বিস্ময়ের ওপরে বিস্ময়। নিত্যানন্দবাবুর বস্তির সম্পর্কে আমি এমন কী করতে পারি যে তার জন্যে আমাকে পারিশ্রমিক দেওয়া

হবে। প্রোপাগাণ্ডা করতে হবে? লিখতে হবে জ্বালাময়ী প্রবন্ধ?

বললাম, কী করতে হবে?

—বেশ ভালো করে একটা সিনেমার গল্প লিখে দিন। দুঃস্থ মজুর, পীড়িত, নির্যাতিত—বড় লোকের অত্যাচারে কেমন করে মরে যাচ্ছে তার একটা নিদারুণ ছবি এঁকে দিন দেখি?—নিত্যানন্দবাবু আর একটা সিগারেট আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন: দেখিয়ে দিন শোষণের ভয়ঙ্কর রূপ।

কেমন যেন ঘাবড়ে গেলাম।

—আপনার বস্তি থেকে ছবি তুলবেন বুঝি? বাস্তবকে ফুটিয়ে তুলবেন?

—কোথায় বস্তি? মানুষের এই অপমান—মনুষ্যত্বের এই বিকার, এ কি আমি সহ্য করতে পারি মশাই? আমার কোমল প্রাণ—ভারী কোমল প্রাণ—ঢুলু ঢুলু চোখে নিত্যানন্দবাবু আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—তা হলে বস্তির কী হল?

—কী আবার হবে?—সদাশিবের মতো নিত্যানন্দবাবু বললেন, তুলে দিলাম।

—তুলে দিলেন?

—নিশ্চয়।—নিত্যানন্দবাবুর শ্যাম্পু-করা চুল উড়তে লাগল, হাতের হীরের আংটিতে ঝলমল করতে লাগল বিদ্যুতের আলো: উঠতে কি চায়? শেষে পুলিশ ডাকতে হল। ভেঙে-চুরে তারাই সব ব্যবস্থা করে দিলে। আমার থিয়োরি কি জানেন মশাই? ব্যাধি সারাতে হলে মাঝে মাঝে শল্য প্রয়োগ করতে হয়, সমাজের পক্ষেও সেটা প্রযোজ্য, কী বলেন?

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

নিত্যানন্দবাবু বললেন, ওখানে নূতন স্টুডিয়ো করছি, মানে ওই বস্তিটা ভেঙে। লাখ পাঁচেক টাকা বেরিয়ে যাবে বোধ হচ্ছে। যা দাম মশাই, একটা সাউণ্ডের জন্যেই এক লাখ নিলে। এক-একটা ফ্লোরেও কমসে কম এক এক লাখ বেরিয়ে যাবে। আর স্টুডিয়োটা শেষ হলেই আমার প্রথম ছবি তুলব 'দুঃখী দুনিয়া'। লোকে আজকাল এই সবই চায় বুঝলেন না? তা ছাড়া হিন্দী ভারসনই করব, ওর একটা অল্ ইণ্ডিয়া মার্কেট আছে কিনা। লিখবেন গল্প?

আমি কথা বলতে পারছিলাম না, কে যেন আমার জিভটা ভেতর দিকে টেনে ধরেছে। ইয়াঙ্কী ভাষায় দুর্বোধ্য গানটা ক্রমশ প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হয়ে উঠছে। নিত্যানন্দবাবুর বোতামে যা জ্বলছে ওগুলোও কি হীরে?

—তা ছাড়া দুর্ভিক্ষেরও একটা ছবি দিতে চাই—লোকে খুব এক্সাইটেড্ হবে। দিন না দাদা একটা গল্প লিখে, পারিশ্রমিক যা চান—

আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম। বললাম, গল্প আপনার দরকার হবে না, আবার দুর্ভিক্ষ আসছে। রাস্তা থেকে ছবি তুলে নিলেই চলবে। আর 'দুঃখী দুনিয়া' নামটাও সার্থক হবে, অল্প খরচায় ঢের বেশী লাভ করতে পারবেন।

নিত্যানন্দবাবু বিহ্বল ভাবে তাকিয়ে রইলেন, কথাটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না, যেন দম আটকে আসছিল। ছুটে নেমে এলাম রাস্তায়। ঝোড়ো হাওয়ার মতো এক ঝলক রাত্রির বাতাস আমার মুখে-চোখে ঝাপটা দিয়ে গেল।

বাইচ

দুখানা চলেছিল পাশাপাশি; তীরের বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। জলটা যেন বাতাসের মতো লঘু হয়ে গেছে। জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়েও আজ বাইচের নৌকোগুলো তাদের পিছনে ফেলে যেতে পারে।

নদীর দুধারে কাতারে কাতারে লোক। বিজলী বাতির আলোয় ঝলমল করছে জল। পটকা ফুটছে। আগুনের আঁকাবাঁকা রেখা এসে আকাশে উঠছে, হাউই ফেটে পড়ছে একরাশ জ্বলন্ত ফুল ছড়িয়ে। এপারে মেলা বসেছে, মানুষের হট্টগোল উঠছে তাল-মাপা দাঁড়ের আওয়াজকে চাপা দিয়ে।

এমন আনন্দের দিন কখনও আর আসেনি। আগে যখন দুর্গা পুজো হত—হত সরস্বতীর ভাসান, তখনো আশেপাশের গাঁ থেকে বাইচের নৌকো নিয়ে আসত মানুষ, বকশিশ পেত বাবুদের কাছ থেকে। কিন্তু তার সঙ্গে এর তুলনা! সে ছিল ওদের উৎসব। কিন্তু আজকের দিন আমাদের। আমার, তোমার, সকলের। এ হল আজাদীর দিন—মুক্তির দিন। আজকের নদীর এই ঘোলা জলের দিকে তাকাও, আর কারো নৌকো বুক ফুলিয়ে এর উপর দিয়ে ভেসে যাবে না; প্রাণ ভরে টেনে নাও আজকের বাতাস—আর কারো নিঃশ্বাস একে আবিল করে দেয়নি; মাথার উপর যত তারা দেখছো ওরা সব তোমার: এই দিনটিতে একান্তভাবে ওরা তোমারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

হালের মাঝি কয়েকবার সজোরে পা ঠুকল নৌকোর গলুইয়ে। ডুম-ডুম করে দ্বিগুণ বেজে উঠল ডঙ্কার আওয়াজ। দোলা খেয়ে গেল রক্ত।

সাবাস্ জোয়ান, হেঁইয়ো—

আগ্ বাড়ো ভাই, আগ্ বাড়ো—

পাশাপাশি দুখানা নৌকো। প্রতিযোগিতা চলছে এদেরই মধ্যে। বাকি যারা পিছিয়ে পড়েছে, তারা আর ধরতে পারবে না। সুতরাং জীবন-মরণ পণ চলছে এই দুখানার ভিতর।

বাইশ বাইশ করে চুয়াল্লিশ খানা দাঁড় দুই নৌকোয়। প্রত্যেকটি খেপের সঙ্গে প্রতি মাল্লার বাহু থেকে বুক পর্যন্ত পেশীতে পেশীতে ঢেউ খেলছে। ক্লান্তি নয়, অবসাদ নয়। হাতের শিরাগুলো ঢিলে হয়ে আসতে চাইলেই হালের মাঝি গলুইয়ে পা ঠুকে চেঁচিয়ে উঠছে বিকট গলায়। ডঙ্কার শব্দে ফেটে যাচ্ছে ঘোর। : আগ্ বাড়ো ভাই, আগ্ বাড়ো—

সামনের ওই বাঁক ঘুরে এক পাক। আরো এক পাক তারপরে। তারও পরে ওই বাঁধা ঘাটে ভিড়তে পারলেই জিত। ইনাম, বক্শিশ।

সামনে দুখানা চলছে গায়ে গায়ে। কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যেতে পারছে না। সমানে সমানে!

এই, তোমার হৈল কী? সাগু খাইয়া টান মারো নাকি?

গলুইয়ের মাঝি এ নৌকোর তিন নম্বর দাঁড়ের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল।

তিন নম্বর ভাসা ভাসা চোখে তাকাল। কপালে টলটলে ঘাম। বাহু দুটো যেন ছিঁড়ে পড়ছে তার। পিছন থেকে কেউ যেন একটা আসুরিক চাপ দিয়ে তার পিঠ পাঁজর ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে।

ওই বাঁকের পর আরো এক পাক! তারও পরে ওই বাঁধাঘাট! তিন নম্বরের সমস্ত চিন্তাগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে একাকার হয়ে। সব ঝাপসা। সব অস্পষ্ট। কোন অর্থ নেই চারপাশের ওই আকাশ-

ফাটানো চীৎকারের ; আলোগুলো সব লেপটে যাচ্ছে একসঙ্গে ; উড়ন্ত হাউইয়ের জেল্লা চোখের মণিতে এসে বিঁধছে একরাশ কাঁটার মত।

তবু প্রাণপণে সে দাঁড়ে টান মারল। টান মারল যন্ত্রের মত। জিততেই হবে যেমন করে হোক। বকৃশিশ মিলবে, ইনাম মিলবে। আর মিলবে খাবার। তা ছাড়া শহরে কোথায় যেন বিনা পয়সায় খেতে দিচ্ছে আজ। আনন্দের দিন। বাজি পুড়ছে, হাউই উড়ছে। আল্‌গা হয়ে গেছে বড়লোকদের শক্ত মুঠো ; দরাজ হয়ে গেছে দিল।

ডুম-ডুম-ডুম

ডঙ্কার আওয়াজ। আরো জোরে টান মার জোয়ান—আরো জোরে। পাশাপাশি চলেছে দুখানা। প্রতিযোগিতা চলেছে সমানে সমানে। জিততেই হবে। দুধার থেকে চীৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে অগুন্তি লোক।

আগ্‌ বাড়ো, আগ্‌ বাড়ো—

এরই মধ্যে এক ফাঁকে বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে ফেলল তিন নম্বর।

চারিদিকে আলো, উৎসবের সমারোহ। এত তারা, এত বাতাস সব তোমার। খোদা মেহেরবান। কিন্তু ওই গ্রামে তো একথা মনে হয় না কখনো।

সেখানে এখন বাঁশ-ঝাড়ের উপর রাত নামল। রাত—মহিষের পচা চামড়ার মত দুর্গন্ধে ভরা কালো রাত। খালের জল জাগ-দেওয়া পাটের গন্ধে আবিল। বাতাসে মশার গুঞ্জন। ভাগাড়ের হাড় নিয়ে টানাটানি করতে করতে তারায় ছাওয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে

তাকিয়ে মড়া কান্না কেঁদে উঠছে কুকুর।

নারকেল বনের ছায়ার পিছনে তিন নম্বরের ঘর। গলে কালো হয়ে যাওয়া শনের ছাউনির ভিতর দিয়ে অজস্র জল পড়ছে এবারের বর্ষায়। টুপটুপ করে ঘরের ভিতর পড়েছে শাদা শাদা এক রকম শুঁয়ো পোকা, পচা শনের মধ্যে ওরা জন্মায়। বাঁশের খুঁটিগুলো একেবারে ফোঁপরা, ফুটো দিয়ে কাঁচপোকা উড়ে যায়। খুঁটির গায়ে কান পাতলে শোনা যায় ঘুর ঘুর করে পোকার ডাক।

এবারের ধান পেলে হয়ত সুরাহা হবে কিছু। খড়ও মিলবে দু-চার কাহন। কিন্তু তারপর?

দুটো মাস—বড় জোর দুটো মাস। গত বছর পর্যন্ত গরুটা ছিল, দুধোল্ গাই। ধার করে খড় খাওয়াতে হয়েছে। এবার আর গরুটা নেই, কিন্তু ধার রয়ে গেছে। ওই খড় সে ধার শোধ করতেই যাবে। যা বাকি থাকবে তাতে আর চাল ছাওয়া চলবে না।

দুটো মাস চলবে ধানে—ধার শোধ করে ওর পরে আর কিছু থাকবে না। তারপর আবার যে কে সেই। মাইন্দার খাটতে হবে—ধার করতে হবে, জঙ্গলে জঙ্গলে খুঁজতে হবে তিত্ পোরোল আর বুনো-কচুর মুখী। খালের কাদাভরা জলে নেমে খোড়লে খোড়লে হাত পুরে দিয়ে খুঁজতে হবে শোল আর বান মাছ—ঢোঁড়া সাপের কামড় উপেক্ষা করেই।

এত আলো এখানে—এত লোক! তবু কী অদ্ভুতভাবে খাঁ খাঁ করে গ্রাম। মনে হয় মানুষ নেই কোথাও—সব ছায়া হয়ে লুকিয়ে গেছে বাঁশবনে—হারিয়ে গেছে নারকেল গাছের অন্ধকারে। ওদের ছাড়া-ভিটেগুলোতে আগে পাল-পার্বণে তবু কিছু লোকজন আসত, গ্যাসের লম্বা লম্বা নলে আলো জ্বলত, পুজো হত, কলের গান বাজত।

কিন্তু এখন এক কোমর জঙ্গল গজিয়েছে সে সব জায়গায়। শেয়াল ঘোরে, ভিটের কোলে কোলে গজিয়ে ওঠা থানকুনি পাতার বনে কুণ্ডলি পাকায় চন্দ্রবোড়া। সকাল-সন্ধ্যে-মাঝরাত্তির—যখন তখন আঁত্‌কে আঁত্‌কে ডেকে ওঠে তক্ষক।

মরুক গে। যারা গেছে তারা যাক। কিন্তু যারা আছে?

মাতব্বরেরা মুখে হাত চাপা দেন। শাসায় কেউ কেউ। দারোগা যখন আসেন—তখন আর একবার মনে করিয়ে দিয়ে যান—সব ঠিক হয়ে যাবে, দুদিন সবুর করুন। বড় বড় সাহেবেরা কখনো কখনো পাশের গঞ্জে এসে সভা করেন: হবে, হবে—সব হবে—

মুহূর্তের ভাবনার মধ্যে এতগুলো কথা ভেসে গেল। উড়ে গেল বাইচের নৌকোর মত।

ডঙ্কার শব্দ। চীৎকার। হালের মাঝির ভর্ৎসনা।

কোন্‌হান থিকা এইডারে আনল রে? সমানে ঝিমাইতে আছে। টানো টানো—

তিন নম্বর আবার চোখের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ মেলে ধরতে চাইল। তাকেই বলছে। বলবেই তো। সে তো নিজেও জানে দাঁড়ের প্রত্যেকটি টানের সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের শিরাগুলো ছিঁড়ে যাবার উপক্রম করছে। সে তো বুঝতে পারছে তার পিঠের উপর যেন একটা তিন মণী বোঝার চাপ—সমস্ত হাড়-পাঁজরা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তার।

—সাগু খাও—সাগু খাও নাকি?

আবার ধিক্কার। কিন্তু সাগু! নিজের অজ্ঞাতেই এক টুকরো হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণায়। আজ পাঁচ বছরের ভিতরে সাগুদানা চোখে দেখেছে নাকি তিন নম্বর? শুনেছে শহরে নাকি পাওয়া যায়—আট টাকা করে সের।

সাবাস জোয়ান, হেঁইয়ো—

পাশাপাশি চলেছে দুখানা। সমানে সমানে। এক ঝাঁকি দিয়ে ওদের গলুই দু'হাত এগিয়ে যায়, ওরা আর এক দমকে তিন হাত বেরিয়ে যায়। টানো টানো—প্রাণপণে টানো। ইনাম, বক্‌শিশ—খাবার। দু'ধারের লোকগুলো আরো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে—আরো একাকার হয়ে যাচ্ছে আলোগুলো। হাওয়ার উড়ন্ত গতি ছুরির ধারের মতো কাটছে চোখ দুটো। অর্থহীন শব্দের গর্জন কানের মধ্যে ভেঙে পড়ছে জোয়ারের জলের মত।

বাঁক আর দূরে নেই। এলাম বলে। তারপরে আর এক পাক। আরো এক পাক! ওরা সমানে সঙ্গে চলছে। আশ্চর্যভাবে শক্তির সমতা ঘটে গেছে একটা।

কিন্তু—

গরুটা। দুধোল্ গাই। কাল্‌চে বাদামী রঙ—শুধু মাথার উপরে শিংয়ের তলায় খানিকটা শাদা। নাম ছিল চাঁদ-কপালী।

থাকবার মত ওটাই ছিল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ভাঙা কপালে আর সইল না চাঁদ-কপালী। মাত্র ত্রিশটা টাকার জন্যে বেচে দিতে হল।

তিন সের দুধ দিত দুবেলায়। ঘন মিষ্টি দুধ—পাতার উপর ধরলে আঠার মত লেগে থাকত। সেই গরু বিক্রী করতে হল। যেতে চায়নি। শিং নেড়ে আপত্তি করেছিল প্রথমে—বসে পড়েছিল চার পা ভেঙে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একরকম হিঁচড়েই নিয়ে গেল লোকগুলো। যাবার আগে একবার গভীর কালো দৃষ্টি মেলে চেয়েছিল তিন নম্বরের মুখের দিকে। অবলা জীবের সে দৃষ্টি আজও সে ভুলতে পারেনি, মনে পড়লে এখনো কল্‌জের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে।

যাক। সবই গেছে—ওটাও যাক। শুধু লুটিয়ে লুটিয়ে কেঁদেছিল

মেয়েটা। এখনো ছেলেমানুষ, এখনো কাঁদে। কিন্তু—

তিন নম্বর কলের মত দাঁড় ফেলতে লাগল। রোগা মেয়েটা। পাশের বাড়ির মতব্বরের বৌয়ের জিম্মায় রেখে এসেছে। দরদ আছে মাতব্বরের বৌয়ের—মেয়েটাকে একটু ভালোও বাসে। কিন্তু হাজার হলেও পর—পর। কতখানি সে করতে পারবে?

এত আলো—এত লোক—এত আনন্দ। সব ভুলে যেতে হয়। বাঁশবন নয়—পোকা খাওয়া গলে যাওয়া চালের শন নয়—পাট-জাগানো খালের রাঙা জল থেকে নাড়িতে মোচড়-দেওয়া দুর্গন্ধ নয়, তারা-ছাওয়া আকাশের তলায় ভাগাড়ের হাড় নিয়ে কুকুরের মড়া-কান্নাও নয়! মেলা বসেছে। বাজনার শব্দ উঠছে। নানা রঙের পোশাকের ঝিলিক। বিজলী বাতির আলোয় ঝলমলে নদীর জল।

এ সব তোমার। আর কেউ নেই। অধিকার নেই আর কারো। বুক ভরে নিঃশ্বাস নাও। আনন্দে কানায় কানায় ভরে ওঠ। টান দাও বাইচের নৌকোর দাঁড়ে।

মেয়েটা। আট বছর বয়েস। ওই এক বন্ধন। ওটা হওয়ার এক বছর পরে আকালে ওর মা গেল—বড় ভাই দুটো গেল। ওকে বুকে করে শহরে এসে—এ-ঘাটায় ও-ঘাটায় ঘুরে কী করে যে বেঁচে রইল তিন নম্বর, তাই আশ্চর্য!

তারপর দিন বদলাল। শোনা যায় দুনিয়াও পালটাল। সব তোমার—আমার—সকলের। চারদিক থেকে তারই জয়ধ্বনি। কিন্তু—

আকালে মরল না, আজ যেন বাঁচবার রাস্তা কোথাও পাচ্ছে না। উৎসব—আনন্দ। ওদিকে সাতদিন জ্বরে ভোগবার পরে কাল দুটি ভাত পাবে মেয়েটা। অথচ কোথায় ভাত? পরশু পর্যন্ত পান্তা-ভাতের জল ছিল নিজের। আজ সকালে বিনা নুনে খেয়ে এসেছে

সেদ্ধ কচুর গোড়া। এতক্ষণে—এতক্ষণে টের পেল তিন নম্বর। অসহ্য ক্ষুধা। তাই চোখে ঝাপসা দেখছে, ম্লান হয়ে আসছে আলোগুলো, কানের কাছে ঝিঁঝিঁর ডাক। হাতের শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে—ভেঙে যাচ্ছে পিঠের পাঁজর।

শাঁ—

বেগে একটা মোড় ঘুরল বাইচের নৌকো, ঘুরে গেল চক্রাকারে। আবার ফিরে যেতে হবে এই তিন মাইল পথ—ফিরতে হবে এখানে; তারপরে ওই বাঁধা ঘাটে। আনন্দের দিন—আনন্দের দিন। দু'পার থেকে উৎসাহ দিচ্ছে লোকে—হাততালি দিচ্ছে। কিন্তু কিছুই কানে যাচ্ছে না যেন তিন নম্বরের। দাঁড় টানছে—টেনে যেতেই হবে। সেদ্ধ কচুর গোড়াগুলো কখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে পেটের মধ্যে। খাবার চাই—চাই চাল।

সাতদিন পরে ভাত খাবে মেয়েটা। শুকনো শীর্ণ মুখখানা ভাসছে চোখের সামনে। নিজের জন্যে সে আর ভাবে না—অনেককাল আগেই চুকিয়ে দিয়েছে সে-সব। আকালে যাকে বুক দিয়ে বাঁচিয়েছিল—আজকের নতুন মাটিতে, নতুন হাওয়ায় তাকে সে কিছুতেই মরতে দেবে না।

হালের মাঝি পা ঠুকছে অস্থিরভাবে। একবার ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল তিন নম্বর। মাথায় গামছা বাঁধা—বাবরি চুলগুলো উড়ছে হাওয়ায়। টকটকে লাল দুটো চোখ—যেন নেশা করেছে। খুন চেপেছে ওর মাথায়—আগুন ঝরছে দৃষ্টিতে।

সে ছাড়া আরও একুশ জন দাঁড় ফেলছে। দাঁড় ফেলছে তালে তালে। গায়ে চকচক করছে ঘাম। হাত থেকে বুক পর্যন্ত পেশী দুলছে টানে টানে। দাঁড়ের ঘায়ে ঘায়ে ছিঁড়ে-যাওয়া কচুরির গন্ধ

ছাপিয়ে উঠছে মানুষের ঘামের গন্ধ।

না, কচু সেদ্ধ খেয়ে আজ সে বাইচ খেলতে আসত না। ফেলে আসত না মা-মরা অসুস্থ মেয়েটাকে। পিছন থেকে এখনো যেন কান্না আসছে : শহরে আমিও যামু—আমারে ফেইল্যা যাইয়ো না বা-জান…

অনেক দূর…অনেক দূর পর্যন্ত তার কানে ভেসে এসেছে সেই কান্নার শব্দ। নারকেল বন পেরিয়ে, বাঁশবন ছাড়িয়ে…একেবারে খালের ঘাট পর্যন্ত। অস্পষ্ট থেকে আরো অস্পষ্ট। তারপর মিলিয়ে গেছে। একেবারেই কি মিলিয়ে গেছে? না…না। তিন নম্বরের হাত অবশ হয়ে এল। দু-পারের সমস্ত হট্টগোল ছাপিয়ে এখনো কানের ভিতর বাজছে শীর্ণ গলার সেই টানা সুরের আর্তি : যাইয়ো না বা-জান, আমারে ফেইল্যা যাইয়ো না…

কিন্তু খাবার চাই—চাই চাল। শহরে উৎসব। বাইচের প্রতিযোগিতা। কত রঙ ও বে-রঙের পোশাকপরা মানুষ—খুশিতে আলো হয়ে-যাওয়া মুখ। দিনের সেরা দিন। ধনীর প্রাণ আজ দরাজ হয়ে গেছে। চাল বিতরণ হচ্ছে—খাবার বিতরণ হচ্ছে।

সে তো আজকের জন্য। একটা দিনের জন্য ক্ষিদে মিটল। তারপর কাল? পরশু? দিনের পর দিন? কোথায় আলো—কোথায় কে! শুধু পচা মোষের চামড়ার গন্ধ উঠবে অন্ধকারে—মড়কের আভাস তুলে কেঁদে কেঁদে বেড়াবে কুকুর। আকাল এসেছিল; একটা দমকা হাওয়ায় ঝরা পাতার মতো উড়িয়ে দিয়েছিল সব। কিন্তু এখন ঘুণ! বাঁশ কাটছে, কাটছে দাওয়ার খুঁটি। সে খুঁটির ওপর কান পাতলে ভিতরে ঘুর ঘুর করে তাদের ডাক শুনতে পাওয়া যায়!

আরো জোরে দাঁড়…আরো জোরে…

এতক্ষণে—এতক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বির নৌকোটা একটু পিছিয়ে পড়েছে। সাবাস জোয়ান। জিতব আমরা; আমরাই নেব ইনাম-বক্‌শিশ। সাবাস্!

কেউ কথা বলছে না। কথা বলবার সময় নেই কারো। দাঁতে দাঁত চেপে সমানে টেনে চলেছে। ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্—ঝপ্ ঝপাস। নৌকোর তলা দিয়ে খড়্গের মতো ছুটে যাচ্ছে জল। ফেনা ফুটছে—ঝিকিয়ে উঠছে বিজলীর আলোয়।

—এই হারামী সুমুন্দির হাত লড়ে না ক্যান? এই হালার লইগ্যাই আমরা হারুম!

রক্ত-ঝরা চোখে তার দিকে তাকাল হালের মাঝি। কটু গালটা বর্ষণ করল তিক্ততম ভাষায়!

তিন-নম্বর পিঠ চাড়া দিয়ে উঠে বসল। হারামী! ইচ্ছে করল লোকটার গলা টিপে ধরে গাঙের মধ্যে ফেলে দেয়।

কিন্তু না···চাল চাই তার, চাই খাবার, চাই ইনাম। মেয়েটার কান্না কানে বাজছে: বা-জান···বা-জান! দু-পার থেকে হাততালি দিচ্ছে লোকে। জিততেই হবে···জিততেই হবে! অসুরের মতো দাঁড়ে একটা টান দিলে তিন নম্বর!

—বাহারে জোয়ান—এই তো চাই!

এমন দিন আর কী হয়? আমার···তোমার···সকলের! আজাদীর দিন! জেলার হাকিমের লঞ্চ থেকে হাত তুলে উৎসাহ দিলেন হাকিম স্বয়ং। চোখের উপর ছুরির ধার বুলিয়ে আর একটা হাউই উঠল আকাশে।

আবার আপ্রাণ চেষ্টায় দাঁড়ে ঝাঁকি মারল তিন নম্বর।

কিন্তু কতক্ষণ আর জোর বইবে পান্তা-ভাতের জল···আলুনি

কচু সেদ্ধ! চড়াৎ করে বুকের মধ্যে কী ছিঁড়ে গেল একরাশ—মুখ দিয়ে গলগল করে নামল নোনা রক্ত। তারপর মিলিয়ে গেল সব আলো···সমস্ত কোলাহল, এমন কি রোগা মেয়েটার কান্না পর্যন্ত। টুপ করে একটা পাকা ফলের মত নৌকো থেকে খসে পড়ল তিন নম্বর···মিলিয়ে গেল উৎসবের বিজলী-ঝলমলে জলের মধ্যে।

গোত্র

বৃষ্টিটা অত্যন্ত বেয়াড়াভাবে নেমে এল। আকাশের হালকা হালকা মেঘগুলো সারা সকাল ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ প্রায় বিনা নোটিশেই তারা জুড়ে এল একসঙ্গে। কোথা থেকে একটা ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল পথের ওপর, একটুকরো কাগজ ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে অনেক দূরে উড়ে চলে গেল, চোখে-মুখে ধুলো ছড়িয়ে পড়ল একরাশ, তারপরে নেমে এল রাশি রাশি শ্বেতকরবীর মত বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা।

বিশৃঙ্খল শাড়িটাকে সামলাতে সামলাতে সন্ধ্যা উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকাল। সব চাইতে কাছের গাড়ি-বারান্দাটাও প্রায় দু' শো গজ দূরে। ওখানে পৌঁছুবার আগেই জামা-কাপড়ের কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না। পাশেই মিঠাইয়ের দোকান থেকে হাতখানেক টিনের ঝাঁপ ফুটপাতের দিকে এগিয়ে এসেছে। আপাততঃ ওখানেই আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই আর।

আকাশ-চেঁড়া খানিকটা চোখ-ঝলসানো বিদ্যুৎ, গরগরে মেঘের গর্জন—বৃষ্টি আরও চেপে এল। মিঠাইওলার কাচের বাক্সটায় প্রায় পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সন্ধ্যা। টিনের ঝাঁপ থেকে ঝরঝরিয়ে জল পড়ছে সামনে। জল-কাদার ছিটে এসে জুতো আর শাড়ির পায়ের দিকটা ভিজিয়ে একাকার করে দিচ্ছে। এলোমেলো হাওয়ায় বৃষ্টির দু-একটা ছাট চোখে-মুখে এসেও আছড়ে পড়ছে। তবু যেটুকু আত্মরক্ষা করা যায় এর মধ্যেই। ক্লান্ত বিমর্ষ দৃষ্টিতে সন্ধ্যা আকাশের দিকে তাকাল।

আরও মেঘ—আরও মেঘ। আরও কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে চারদিকে। তার মানে, বৃষ্টি এখন আর সহজে থামছে না। স্কুলে লেট অনিবার্য।

নিরুপায় ভাবে একবার ঠোঁট কামড়াল সন্ধ্যা। চাকরিটা এমনিতেই টলমল করছে—এবারে যাবে। প্রায়ই শোনা যাচ্ছে, অন্ততঃ স্কুল-ফাইন্যাল পাস না হলে কোন টীচারকেই আর রাখা হবে না। প্রাইমারি ক্লাসেও না। আণ্ডার-ম্যাট্রিক সন্ধ্যা। সন্ধ্যার মাথার ওপর খাঁড়াটা সব সময়েই দুলছে। এভাবে লেট হতে থাকলে সেটা নেমে আসতে খুব বেশী সময় লাগবে না।

ছাতা একটা ছিল—খোয়া গেছে দিনকয়েক আগে। নতুন মাসের মাইনে হাতে না আসা পর্যন্ত আর একটা কেনা সম্ভব নয়। বৃষ্টির রেণু জড়ানো ঘোলাটে চশমার মধ্য দিয়ে সন্ধ্যা দেখতে লাগল, দূরে খরধার বর্ষণের ভেতর ট্রামের ছায়ামূর্তি বেরিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা। কিন্তু কোন উপায় নেই। ট্রাম-স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে নির্ঘাত অবগাহন-স্নান করতে হবে তাকে।

দমকা হাওয়ায় আবার ছাট এল এক পশলা। কাচের বাক্সটার

গায়ে শরীরকে যথাসাধ্য এলিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগল। জুতোটা ভিজে জবজব করছে। শাড়ির পাড় কালো কাদার ছিটেয় একাকার।

মনের মধ্যে একরাশ ভাবনা। আশঙ্কা-মাখানো, অপ্রীতিকর। ভাবতে অসহ্য লাগে, না ভেবেও উপায় নেই। আড়াই হাত চওড়া গলির ভেতরে একতলার একখানা ঘর। দেওয়ালে উইয়ের রেখা। বড় ভাই সিনেমার গেট-কীপার—মাইনে কী পায় কে জানে! সংসারে দশ-পনের টাকার বেশী সাহায্য মেলে না তার হাত থেকে। ছোট ভাইটা কর্পোরেশনের স্কুলে ফ্রীতে পড়ে, কিন্তু কী যে পড়ে বলা শক্ত। মায়ের আরথ্রাইটিস। নিজের মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে। জীবন।

জীবন। আকাশ-ভাঙা একটানা বৃষ্টি। ট্রামের ছায়ামূর্তিগুলো আরও আবছায়া। জলে-কাদায় পায়ের জুতোটার অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেতে বসেছে।

—চলুন না, ট্রাম পর্যন্ত এগিয়ে দিই।

সন্ধ্যা চমকে উঠল। সেই ছোকরা। হ্যাঁ, সেইটেই।

তাদের গলির মোড়ে চায়ের দোকানটায় রাতদিন বসে থাকে। বিড়ি টানে অনর্গল। পথ-চলতি মেয়েদের চোখ দিয়ে গিলে খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজকর্ম নেই ওর। সিনেমার প্রত্যেকটা গানই জানা। তার চাইতেও ভাল করে জানা কোন্‌টা কখন লাগসই হবে। আগে নাকি মেয়েদের একেবারে গায়ের ওপরেই এসে পড়ত, মাঝখানে একবার পুলিশে ধরে নিয়ে যাওয়াতে সেটা বন্ধ হয়েছে।

পানের রসে রাঙানো কতগুলো বীভৎস দাঁত বের করে ছোকরাটা হাসল : আমার ছাতা আছে।

সন্ধ্যার ইচ্ছে করল, প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দেয় ছেলেটার গালে। কিন্তু এইখানেই তো শেষ নয়। এর পরে রাত আছে, আর আছে আধো-অন্ধকার প্রায়-নির্জন গলি। টুইশন সেরে সে-গলি দিয়ে বাড়ি ফিরতে প্রায়ই তার নটা সাড়ে-নটা বাজে।

দু' চোখে বিদ্যুৎ জ্বেলে সন্ধ্যা মুহূর্তের জন্যে ছোকরার বিগলিত মুখের দিকে তাকাল। তারপর কঠিন গলায় বললে, দরকার নেই।

আবার নির্লজ্জ অনুরোধ শোনা গেল : আপনার স্কুলের দেরি হয়ে যাবে যে! চলুন না।

প্রায় চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল সন্ধ্যার। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, তুমি এখান থেকে যাবে—না লোক ডাকব আমি?

একটা চোখ ট্যারা করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল ছেলেটা। ছাতা খুলে এগিয়ে গেল বৃষ্টির মধ্যে। তারপর জলের আওয়াজ ছাপিয়েও শিস্ টানার একটা তীব্র স্পষ্ট শব্দ ভেসে এল সন্ধ্যার কানে। পায়ের একপাটি জুতো খুলে ওর দিকে ছুঁড়ে দেওয়ার উগ্র বাসনাটাকে প্রাণপণে দমন করল সন্ধ্যা।

বাড়ি ফিরতে বিকেল পাঁচটা। ক্ষিদে, ক্লান্তি আর বিষাক্ত অপমানে সারা মন জর্জরিত। লেট করে যাওয়ার জন্যে আজও হেড মিস্ট্রেসের কথা শুনতে হয়েছে।

—তোমার ছাতা হারিয়ে গেছে বলে তো আর সারা বছর স্কুলে রেনি-ডে দেওয়া সম্ভব নয়। যদি আসতে অসুবিধে হয়, ছুটি নাও।

ছুটি নাও। খুব ভদ্র ভাষাতেই কথাটা বলা হয়েছে, সন্দেহ কী! একেবারে পাকাপাকি ছুটির বন্দোবস্ত। এম. এ; এম. এড হেড

মিস্ট্রেস মার্জিত রুচির আড়ালটুকু বজায় রেখেছেন, কিন্তু তীর গিয়ে বিঁধেছে যথাস্থানে। বিষ-মাখানো তীর।

ভিজে জুতোর মধ্যে ক্লেদাক্ত পা দুটো টানতে টানতে ফিরছিল সন্ধ্যা। গলির মোড়ের চায়ের দোকান থেকে ক্রুত কণ্ঠের গান জেগে উঠল : হাওয়ামে উড়্‌তা যায়ে, লাল দো-পাট্টা মল্‌মল্‌—

সেই ছোকরাই। এক ভাঁড় চা হাতে, আর এক হাতে জ্বলন্ত বিড়ি। দোকানের আলোতে দেখা গেল, একটা চোখ ট্যারা করে তাকিয়ে আছে কুৎসিত দৃষ্টিতে, মুখে সেই বীভৎস ভঙ্গি।

সন্ধ্যা পা চালাল তাড়াতাড়ি। একটা অশ্রাব্য হাসির আওয়াজ যেন তাড়া করে এল পেছন থেকে।

বাড়িতে ঢুকতেই চোখ পড়ল, বড়দা বিজয় কাবলী চটিতে পা গলিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছে।

—দাদা!

সিঁড়িতে এক ধাপ নেমেছিল বিজয়, বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরাল।

—বেরিয়ে যাচ্ছি, পেছু ডাকলি কেন?

—একটা জরুরী কথা আছে।

বিজয় ভ্রূ কোঁচকাল, সস্তা হাতঘড়িটার দিকে তাকাল একবার।

—আমার টাইম হয়ে গেছে, পরে শুনব।

—দু'মিনিট দেরি হলে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। কথাটা সত্যিই খুব দরকারী।

সন্ধ্যার রুষ্ট উত্তেজিত গলার স্বরে আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বিজয়। অপ্রসন্ন মুখে বললে, কী হয়েছে?

—গলির মোড়ের ওই ছোকরাটার জ্বালায় তো রাস্তায় আর হাঁটা যায় না। একটা ব্যবস্থা কর।

—বুঝতে পেরেছি—সুখেন।—বিজয় চিন্তিত হয়ে ঘাড় নাড়ল : পয়লা নম্বরের গুণ্ডা।

—গুণ্ডা তো কী হয়েছে? ধরে সায়েস্তা করে দাও।

—হ্যাঁ, সায়েস্তা করাই উচিত। বিজয় আবার মাথা নাড়ল : তবে কি জানিস, ও তো আর একা নয়। দস্তুরমত দলবল আছে, বলতে গেলে পাড়ার মালিক ওরাই। দেখলি নে, পুলিশে নিয়ে গিয়েও ওকে হজম করতে পারল না? আমরা পাড়ায় নতুন ভাড়াটে, আমাদের কে দেখবার আছে, বল্? তা ছাড়া সন্ধ্যেবেলা যদি গলির ভেতরে ঘ্যাচাং করে ছুরিটা বসিয়ে দেয়,—তাহলেই বা ওকে আটকাচ্ছে কে?

—এর কোনও প্রতিকার নেই দাদা? ক্ষোভে অপমানে সন্ধ্যার মুখ-চোখ জ্বালা করতে লাগল : পথে বেরুলে যা-তা রিমার্ক করবে, যাচ্ছেতাই গান গাইবে, অপমান করবে, দেশে কি আইন নেই?

—আইন! হুঁ! ওদের আইন ওদের হাতে।

—আমি পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লিখব।

—উল্টো ফল হবে তাতে।—বিজয় দার্শনিক ভঙ্গি করলে : একটা খোঁচা দেওয়া হবে কেউটে সাপকে। দুটোকে ধরে নিয়ে যাবে, বাকিগুলো ছুরি শানাবে বসে বসে। মিথ্যে ওদের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। আর তা ছাড়া—। বিজয় উদারভাবে হাসতে চেষ্টা করলে : বললেই বা দুটো একটা কথা। গায়ে তো আর ফোসকা পড়ছে না! কান না দিলেই পারিস।

—দাদা!—তীব্র গলায় প্রায় চীৎকার করে উঠল সন্ধ্যা। কিন্তু বিজয় আর দাঁড়াল না। আমার টাইম হয়ে গেছে।—বলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল, যেন পালিয়ে বাঁচল সন্ধ্যার সামনে থেকে।

—কাপুরুষ, মেরুদণ্ডহীন!—সন্ধ্যার চোখ ফেটে জল আসতে লাগল।

কিন্তু কাঁদবার সময় নেই। উনুন ধরিয়ে সাড়ে ছটার মধ্যে রান্না সেরে, অথর্ব মা আর ছোট ভাইটার খাবার ব্যবস্থা করে রেখে তাকে বেরিয়ে যেতে হবে। সাতটা থেকে সাড়ে আটটা—এই দেড় ঘণ্টা টিউশন। ছুটি ছোট ছোট মেয়েকে পড়াতে হয়। মাসান্তে কুড়ি টাকা। আণ্ডার ম্যাট্রিকের পক্ষে লোভনীয়।

শুধু বেরুবার মুখে গলির মোড়ের সেই চায়ের দোকানটা। ফেরবার সময় আর একবার। অক্ষম অপমানে আর বিজয়ের ওপরে অসহ্য ঘৃণায় সন্ধ্যার যেন নিশ্বাস আটকে আসতে চাইল। কয়লা ভাঙতে গিয়ে হাতুড়িটা বাঁ হাতের ওপর এসে পড়ল, একটা আঙুল ছেঁচে গেল—কিন্তু শরীরের যন্ত্রণা অনুভব করবার মত মনের শক্তিও সে যেন খুঁজে পেল না।

মুখিয়েই ছিল সেই ছোকরা—সেই সুখেন। বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই অভ্যর্থনা কানে এল : গোরী গোরী বাঁকে ছোরী—

সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে পড়ল এক মুহূর্তের জন্য। এ পাড়ায় কি ভদ্র ছেলে একজনও নেই ? এই খোলার চাল আর ভাঙা পুরনো বাড়ির রাস্তায় সাধারণ সভ্যতা ভব্যতাও পথের ধারের ডাস্টবিনের জঞ্জালে হারিয়ে গেছে ? একবার ভাবল, এগিয়ে যায় সুখেনের সামনে, খুলে নেয় পায়ের জুতোটা, তারপর—

তারপর। ওরা নীচুতলার জীব—ছু-এক ঘা জুতো খেলে ওদের অপমান হয় না। কিন্তু কেলেঙ্কারির লজ্জাটা সন্ধ্যা নিজেই সইবে কী করে ? তা ছাড়া একটা কথা ঠিকই বলেছে বিজয়। রাতের পর রাত আছে—টিউশন সেরে এই পথ দিয়েই ফিরে আসতে হবে। তখন ?

ছাত্রী দুটোকে পড়াতে বসেও সন্ধ্যা বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। রাত যত বাড়ছে, পথটার কথা ততই বিভীষিকার মত চেপে বসছে মনের ওপর। সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতেই সে ছটফট করে উঠে দাঁড়াল।

বেরুবার মুখেই দেখা হল গৃহস্বামী হিরণ্ময়ের সঙ্গে। গাড়ি নিয়ে কোথায় চলেছে হিরণ্ময়।

—যাচ্ছেন মিস রায়?

—হ্যাঁ, আসি আজ।—শীর্ণ বিনয়ের হাসি হেসে সন্ধ্যা পা বাড়াল।

হিরণ্ময় বললে, আপনাদের ওই দিক দিয়েই তো আমিও যাব। চলুন না, পৌঁছে দিই।

সন্ধ্যা দ্বিধা করে বললে, কিন্তু—

হিরণ্ময় হেসে বললে, সঙ্কোচের কী আছে? চলুন না।

একটু ইতস্ততঃ করে সন্ধ্যা গাড়িতে উঠল।

দু-একটা ছাড়া কথা হল না রাস্তায়। আপনার ছাত্রীরা কেমন পড়ে? ভালই। পাস করবে তো?—নিশ্চয়ই। ভারী দুরন্ত কিন্তু। ও কিছু না—ছেলেবেলায় অমন হয়ই।

গাড়ি এসে গলির মোড়ে দাঁড়াল।

সন্ধ্যা বললে, গলিতে আপনার গাড়ি ঢুকবে না। আমি নেমে যাচ্ছি এখানেই। ধন্যবাদ, অনেক কষ্ট করলেন।

—কষ্টের কী আছে আর? পথেই তো পড়ল।—হিরণ্ময় হাসল: গলি দিয়ে কতটা যেতে হবে আপনাকে?

—খানিকটা।

—তবে চলুন, পৌঁছে দিয়ে আসি।—হিরণ্ময় নেমে পড়ল।

—না না, সে কি ?

—চলুন না।—সুপুরুষ দীর্ঘদেহ হিরণ্ময় অন্তরঙ্গ গলায় বললে, একটুখানি তো রাস্তা। পৌঁছে দিচ্ছি। আপনার বাসাটাও দেখে আসব—যদি দরকার পড়ে কখনও।

—সে দেখবার মত নয় আপনার।—সংকোচে বিবর্ণ হয়ে গেল সন্ধ্যা।

—আপনি থাকতে পারেন, আমি দেখতে পারব না ? চলুন না।

সন্ধ্যা আর বাধা দিলে না। আর একবার তাকিয়ে দেখল হিরণ্ময়ের সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরের দিকে। বিজয়ের মত ভীতু আর কোলকুঁজো নয়। শক্তি আর পৌরুষের প্রতীক।

দু'পা এগিয়েই চায়ের দোকানটা। যথা নিয়মে সুখেন বসে ছিল। কিন্তু আজ আর কোনও মন্তব্য শোনা গেল না—গানের আওয়াজও না। হিরণ্ময়ের ভারী জুতোর শব্দ সংকীর্ণ অপরিচ্ছন্ন গলির ভেতরে একটা অপরিচিত আভিজাত্যকে সরবে ঘোষণা করতে লাগল।

কৃতজ্ঞ চিত্তে সন্ধ্যা বলে ফেললে, এগিয়ে দিয়ে ভারী উপকার করলেন আমার।

—কেন বলুন তো ?

—না, সে থাক্।—সন্ধ্যা কুণ্ঠিত হয়ে বললে, এমন কিছু না।

হিরণ্ময় কী বুঝল কে জানে। অল্প একটু হাসল।

দোর-গোড়ায় পৌঁছে সন্ধ্যা সসংকোচে বললে, ভেতরে আসবেন না ?

হিরণ্ময় ঘড়ির দিকে তাকাল : হবে আর একদিন। চলি আজ। নমস্কার।

—নমস্কার। অনেক কষ্ট করলেন—

—কিছু না—কিছু না।—পেছন ফিরল হিরণ্ময়। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকাল দাঁড়িয়ে-থাকা সন্ধ্যার দিকে। হেসে একবার ঘাড় নাড়ল, তারপর ভারী জুতোয় অপরিচিত আভিজাত্যের আওয়াজ তুলে ম্লান গ্যাসের আলোয় মিলিয়ে গেল।

আর একবার হিরণ্ময়ের ওপর নিবিড় কৃতজ্ঞতায় সন্ধ্যার মন ভরে উঠল। ভাগ্যিস, বাড়িতে ঢুকতে চায় নি হিরণ্ময়। একতলার এই একখানা কদর্য ঘর—এক ফালি রান্নার বারান্দা। এর মধ্যে কোথায় বসতে দিত হিরণ্ময়কে—কী ভাবেই বা অভ্যর্থনা করত তার ?

চায়ের দোকানের প্রতিক্রিয়াটা টের পাওয়া গেল পরদিন স্কুলে বেরুবার সময়েই।

—আজকাল আবার সঙ্গে বডি-গার্ড ঘুরছে রে!

—সে গাড়ি করে আসে।

—বন্‌কি চিড়িয়া বন বন বোলো রে—

শুনতে পায় নি, এই ভাবেই এগিয়ে চলে গেল সন্ধ্যা।

আবার বৃষ্টি নামল পরদিন। নামল ছাত্রী পড়িয়ে বেরুবার মুখেই। কাল তবু প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে থেমেছিল, আজ সহজে থামবে বলে মনে হল না। কালো আকাশ থেকে বিলম্বিত লয়ের বর্ষণ। করুণমুখে সন্ধ্যা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ছাত্রীদের মা কোথায় নিমন্ত্রণে গেছেন, পাশের ড্রইংরুমে সোফায় এলিয়ে কী যেন পড়ছিল হিরণ্ময়। হাওয়ায় দুটো ঘরের মাঝখানকার পর্দা উড়ছিল—হিরণ্ময়ের কালো চটি আর ডোরাকাটা পাজামার আভাস থেকে থেকে চোখে পড়ছিল সন্ধ্যার। হঠাৎ চটি

আর পাজামা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে এল এদিকে, তারপর পর্দা সরিয়ে হিরণ্ময় ঢুকল।

—সাড়ে আটটা তো বেজে গেল মিস রায়। যাবেন কী করে?

—তাই তো ভাবছি।

—জানলার মধ্য দিয়ে হিরণ্ময় একবার বাইরের আকাশে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে: বেশ ঘটা করে নেমেছে। তাড়াতাড়ি তো ধরবে না!

শুকনো গলায় সন্ধ্যা বললে, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। আমি যাই। দু'পা এগিয়েই ট্রাম পাব।

—তার দরকার কী?—হিরণ্ময় স্থির দৃষ্টিতে সন্ধ্যার দিকে তাকাল: আমি দিয়ে আসছি গাড়ি করে।

রোজ রোজ—। সন্ধ্যার মুখে লালের ছোপ পড়ল:, না-না, সে থাক্।

সন্ধ্যার সেই রঙ-ধরা মুখের ওপর আর একবার চোখ বোলাল হিরণ্ময়। বললে, তাতে আর কী হয়েছে! আমার মেয়েদের পড়াতে এসে আটকে পড়েছেন আপনি—আপনাকে পৌঁছে দেওয়া আমার ডিউটি। একটু দাঁড়ান, তিন মিনিটের মধ্যেই আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি।

অস্বস্তিভরে সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে রইল—মনের দিক থেকে ঠিক যেন সায় পাচ্ছে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গলিটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। এমন বৃষ্টি—অস্পষ্ট গ্যাসের আলো, এমনি রাতে সম্পূর্ণ নির্জনতা। যদি সুযোগ বুঝে সুখেনের দল—

পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল সন্ধ্যার।

হিরণ্ময় কিন্তু তৈরি হয়ে এল তিন মিনিটের মধ্যে। শুধু একটা

ওয়াটারপ্রুফ এনেছে কাঁধে করে। ধরিয়ে এসেছে একটা চুরুট, আর পায়ের চটিটা বদলে নিয়েছে।

—চলুন।

সিঁড়ির গায়েই গাড়ি-বারান্দায় মোটর দাঁড়িয়ে ছিল। ভিজতে হল না।

সামনের কাচে ওয়াইপারের ডানা নড়তে লাগল, টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে চলল মোটর। দুজনেই চুপ। ড্রাইভারের আসনে হিরণ্ময়—পেছনের গদিতে সন্ধ্যা। দু'পাশের ঝাপসা আলোগুলো মনের একরাশ অস্বচ্ছ ভাবনার মত ভেসে যেতে লাগল।

সেই গলির সামনে। গাড়ি থামল।

দরজা খুলে সন্ধ্যা বললে, নমস্কার, আমি আসি।

হিরণ্ময় ব্যস্ত হয়ে বললে, বিলক্ষণ! তা কি হয়? পৌঁছে দিয়ে আসছি।

হিরণ্ময় নামবার উদ্যোগ করলে। তারপরেই বললে, ছিঃ ছিঃ, ভারী ভুল হয়ে গেছে। ছাতা আনি নি—শুধু ওয়াটারপ্রুফটা—

—তাতে কী হয়েছে? আপনি গায়ে দিন। আমি এমনিই যাচ্ছি। এটুকু পথ তো, কী আর অসুবিধে হবে?

—না না, তা হয় না।—হিরণ্ময় ব্যস্ত হয়ে উঠল: যা বৃষ্টি হচ্ছে! দু'পা যেতেই ভিজে যাবেন। এটা আপনিই নিন।—চুরুট আর পাউডারের একটা অদ্ভুত গন্ধ-মাখানো ভারী ওয়াটারপ্রুফটা হিরণ্ময় বাড়িয়ে দিল সন্ধ্যার দিকে।

বিপন্ন হয়ে সন্ধ্যা বললে, নিতেই হবে?

—নিতেই হবে।—গাড়ির ভেতরে একটা ছোট আলো জ্বলছিল, সে আলোয় চিকমিক করে উঠল হিরণ্ময়ের চোখ।

প্রকাণ্ড ভারী ওয়াটারপ্রুফটা গায়ে জড়িয়ে বিব্রতভাবে নামল সন্ধ্যা। সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময়ও।

—ও কি, আপনি নামলেন যে বৃষ্টির ভেতরে?

—ঠিক আছে, চলুন।

কিন্তু চলতে গিয়েও সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে পড়ল। করবী ফুলের মত বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে গ্যাসের আলোয় চকচক করা টুকরো টুকরো জমাট জলের ওপরে। এই এক মিনিটের মধ্যেই হিরণ্ময়ের চুলগুলো ভিজে লেপটে গেছে, গালের ওপর দিয়ে যেন অশ্রুর ধারা ঝরছে।

হঠাৎ সন্ধ্যা বলে ফেলল, তা হলে আসুন, দুজনেই জড়িয়ে নিই এটা। বেশ বড় আছে—কুলিয়ে যাবে এখন।

বলেই সে মরমে মরে গেল—ভয়ে লজ্জায় সিঁটিয়ে গেল শরীর। কিন্তু হিরণ্ময় আর দেরি করলে না। হেসে বললে, তা মন্দ কথা নয়, এক কম্বলে অনেক ফকিরেরই জায়গা হয়।

সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময় ঘেঁষে এল সন্ধ্যার পাশে। একটা বলিষ্ঠ বাহু আর শরীরের স্পর্শ পেল সন্ধ্যা। আরও তীব্রভাবে পেল পোড়া চুরুট আর পাউডারের গন্ধ। তৎক্ষণাৎ ইচ্ছে করল, ছিটকে বেরিয়ে যায় এই ওয়াটারপ্রুফের মধ্য থেকে। কিন্তু শীতল মসৃণ এই আবরণটা যেন নাগপাশের মত তাকে বেঁধে ফেলেছে। সন্ধ্যা নিজেকে মুক্ত করতে পারল না।

হিরণ্ময়ের শরীরের স্পর্শকে, সেই বিরক্তিকর চুরুট আর পাউডারের গন্ধকে যথাসাধ্য ভোলবার চেষ্টা করে যন্ত্রের মত পা ফেলতে লাগল সন্ধ্যা। এ পথটা যেন অনন্ত, আর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ যেন অসহ্য ভয় আর স্নায়ু-ছেঁড়া যন্ত্রণায় আকীর্ণ।

চায়ের দোকানটা কখন ফেলে এসেছে সন্ধ্যা জানে না। জানল

তখন, যখন আকস্মিক ভাবে নাগপাশের শেষ মোচড়ের মত হিরণ্ময়ের একখানা পেশীকঠিন হাত তার কোমর জড়িয়ে ধরল।

—এ কি—এ কি করছেন আপনি!—অবরুদ্ধ গলায় যন্ত্রণার আকূতি বেরিয়ে এল সন্ধ্যার।

দূরের গ্যাসটা বৃষ্টিতে প্রায় সাত হাত জলের নীচে তলাল নির্জন গলি। তবু হিরণ্ময়ের চোখে বাঘের দৃষ্টি চিনতে ভুল হল না।

ফিস ফিস করে হিরণ্ময় বললে, এমন রাত আর দুবার আসবে না সন্ধ্যা।

হিরণ্ময়ের মুখটা নেমে আসছিল—সন্ধ্যার বাঁ হাতের চড়টা ঠিক গালে গিয়ে পড়ল তার। দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠল হিরণ্ময়ের, কী যেন বলতে গেল কটু গলায়। তার আগেই গা থেকে ওয়াটারপ্রুফটা ফেলে দিয়ে সন্ধ্যা চেঁচিয়ে উঠল: ছাড়ুন—ছাড়ুন—ছাড়ুন বলছি—

—ইডিয়ট!—চাপা গলায় প্রায় গর্জন করে উঠল হিরণ্ময়।

আর—সন্ধ্যার চীৎকারেই আকৃষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ পেছনে এসে দাঁড়াল সেই সুখেন: কী—কী হয়েছে?

নাগপাশের মত হাতটা চকিতে খুলে গেল হিরণ্ময়ের। সরে দাঁড়াল দু'পা।

আবছা অন্ধকারে কুৎসিত মুখটা আরও কদাকার, আরও দানবীয়। তবু সেই মুখের দিকে তাকিয়েই শরণাগতের মত আর্তগলায় সন্ধ্যা বললে, না ভাই, কিছু না। আমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দাও কেবল।

ভাই!—সুখেনের মুখের ওপর দিয়ে ঢেউয়ের মত কী দুলে গেল একবার। তারপর সুখেন বললে, চলুন দিদি। আমরা আছি পাড়ার

লোক—গলির মোড়েই আছি, ভাবনা কী। হিরণ্ময়ের দিকে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে সুখেন সন্ধ্যাকে বললে, বৃষ্টিতে ভিজছেন কেন—আসুন আমার ছাতার তলায়।

এবার সুখেনের ছাতার তলায় নিশ্চিন্তে আশ্রয় নিলে সন্ধ্যা। এগিয়ে যেতে যেতে ঘাড় না ফিরিয়েই বললে, অনেক কষ্ট করলেন হিরণ্ময়বাবু। এবার যেতে পারেন আপনি। ধন্যবাদ—নমস্কার।

হিরণ্ময় কিন্তু তার পরেও প্রায় মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। আরও পরে, আধখানা শরীর ওয়াটারপ্রুফে ঢেকে, আধখানা ভিজতে ভিজতে একটা জন্তুর মত ফিরে চলল মোটরের দিকে। দামী মচমচে জুতোটায় জল-কাদা থেকে ছপাৎ ছপাৎ করে একটা কুশ্রী পরাজিত আওয়াজ উঠতে লাগল।

গোখরো

—সাপ, সাপ!

চেঁচিয়ে উঠল বিভা। সজোরে ভূপতিকে ধাক্কা দিয়ে বললে, শুনছ, সাপ!

ওভারটাইম খেটে ভূপতি ফিরেছে রাত সাড়ে দশটায়। ঘুমে আর ক্লান্তিতে ধ্বসে পড়া বাড়ির মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে আছে তার। তুলোয় গিঁট ধরা চ্যাপ্টা বালিশটা থেকে মাথা বেকায়দায় সরে গিয়ে এক-আধটু নাক ডাকছিল বটে, তবু অচেতনার একেবারে গভীর অতলে নিমগ্ন হয়ে ছিল সে। সাপ তো সাপ, এই সময়ে একটা রয়্যাল-বেঙ্গল তাকে মুখে করে তুলে নিয়ে গেলেও জানবার সম্ভাবনা ছিল না ভূপতির।

কিন্তু বিভা রয়্যাল-বেঙ্গলের চাইতেও মারাত্মক। তারপর গত বছর আট মাসের ছেলেটা মরে যাওয়ার পর থেকে অদ্ভুত হিংস্র হয়ে আছে সে। কিছুদিন আগেও মিষ্টি মিন্‌মিনে বউ বিভাকে যারা দেখেছে, আজ আর তারা তাকে চিনতেও পারবে না। বাঁশির মতো গলা এখন কাঁশির মতো প্রখর এবং প্রবল—শান্ত ঠাণ্ডা মেজাজ এখন যেন বিস্ফোরক দিয়ে তৈরী। অতএব অতলান্ত বিরাম থেকে আস্তে আস্তে ভূপতি চেতনার সীমান্তে ভেসে উঠতে লাগল।

—ঘরে যে সাপ ঢুকেছে, শুনছ না? মরেছ নাকি? বিভার গলা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। জোরে ধাক্কা দিতে গিয়ে হাতের নোয়াটার একটা মোলায়েম আঘাত লাগল ভূপতির পিঠে।

—উহুহু! মরলে তো বেঁচে যেতাম!—ভূপতি ধড়মড়িয়ে উঠে বসল: কই সাপ?

—আমার পায়ের ওপর দিয়ে নেমে গেল। হিম ঠাণ্ডা! খাটের তলায় ঢুকেছে বোধ হয়।

গৌরবে খাট, আসলে মাঝে মাঝে তক্তার জোড় খুলে-যাওয়া, নড়লে-চড়লে শব্দ-মুখর পুরোনো একটি তক্তাপোশ। তার তলায় টিনের তোরঙ্গ, থালাবাটি আর খুঁটিনাটি গৃহস্থালীর একটি বিশুদ্ধ সুন্দরবন—মশা, আরশোলা আর নেংটি ইঁদুরের মনোরম উপনিবেশ। তার ভেতর সাপ যদি আশ্রয় নিয়ে থাকে, তা হলে তাকে খুঁজে বের করা আস্তিকেরও অসাধ্য।

কিন্তু সমস্যাটা অন্যত্র।

হাত বাড়িয়ে পাশের ছোট টিপয়ের ওপর রাখা লণ্ঠনটাকে উজ্জ্বলে দিলে ভূপতি। ম্লান মুখে বললে, খাটের তলায়? কী হবে তা হলে?

—বের করে পিটিয়ে মারো! নইলে অন্তত হুড়োতাড়া দাও—পালিয়ে যাক। খাটের নীচে সাপ নিয়ে বসে থাকব, বলো কি গো! মাঝ রাত্তিতে যদি ফোঁস করে—অলক্ষুণে কথা আর শেষ করতে পারল না বিভা। অ্যানিমিয়ায় হলদে শীর্ণ মুখে পাঁশুটে ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল একটু একটু।

ভয়ে এতক্ষণে ভূপতিও কাঠ হয়ে গেছে। চোখভরা ঘুম ঊর্ধ্ব-শ্বাসে প্রায় আসানসোল পার! ফিস্ ফিস্ করে বললে, কী সাপ?

আতঙ্কের মধ্যেও বিরক্তিতে বিভা খিঁচিয়ে উঠল: কী সাপ আমি দেখেছি নাকি? খরিশ-টরিশ হবে বোধ হয়। শোল্‌মাছের মতো মোটা, লম্বাও হবে হয়তো হাত চারেক।

—হাত চারেক! খরিশ!

—কই, কী করবে?—অধৈর্য বিভার জিজ্ঞাসা।

নিরুপায় ভূপতির এইবার খেঁকিয়ে ওঠার পালা।

—কী করব? খাট থেকে নামতে যাই আর তলা থেকে বসিয়ে দিক আমার পায়ে! তখন!

তাইতো। এ-কথাটা বিভার মনে হয় নি। এবারে কান্না এল তার গলায়।

—ওগো, তবে কী হবে? সারারাত এমনি সাপ কোলে নিয়ে বসে থাকব?

—উপায় তো কিছু দেখছি না। সকাল হোক, আপনিই বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে। এটুকু সময় নয় বসে বসেই কাটানো যাক।

এটুকু সময়—সন্দেহ কী! সবে গোটা বারো এখন। অসুস্থ দুর্বল শরীর নিয়ে সারা দিন সংসার ঠেলেছে বিভা, ওভারটাইম খেটে প্রায় অ্যাম্বুলেন্সে চেপে ঘরে ফিরেছে ভূপতি। এই অবস্থায় দুজনে ঠায় বসে ঘণ্টা পাঁচেক জেগে থাকা—খুব লোভনীয় প্রস্তাব নিশ্চয়!

বিভা আকুল হয়ে বললে, না—না, সে হবে না। তলায় আছে, ওপরে উঠে আসতে কতক্ষণ? আমি পাগল হয়ে যাব। হাঁকডাক করো—লোকজন জড়ো হোক—

—হাঁকডাক করলেই বা শুনছে কে এখন? এই বাদ্‌লার এমন রাত্তিরে খুন হয়ে গেলেও কেউ সাড়া দেবে না। এ তো আর কলকাতা শহর নয়!

তা নয়। কলকাতা থেকে বারো মাইল দূরে শহরের উচ্ছিষ্ট অঞ্চল এটা। পাড়াগাঁয়ের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে আশপাশে গোটাকয়েক কারখানা তৈরি করে, কিন্তু নগরলক্ষ্মীর দাক্ষিণ্যও ছড়িয়ে পড়ে নি। দূরে দূরে বিজলী আলো যেন অনুকম্পার কৌতুকে চোখ

মিটমিট করে। ভাঙাচুরো বাড়ি, মুখ থুবড়ানো বস্তি, একটা পীচের রাস্তায় সম্প্রতি বোমার ক্রেটারের মতো অসংখ্য গর্ত। এদিক-ওদিকে দু-একটা পোড়ো ইঁটের পাঁজা থাকায় সাপের বংশবৃদ্ধির সুযোগ হয়েছে। এলোমেলো ঝোপ-জঙ্গল, ন্যাড়াটে গাছগুলোর প্রাণহীন পাতায় আধইঞ্চি পুরু কালির আস্তর।

ভূপতির দৌলৎখানা এরই মধ্যে আবার একটু একটেরেক। রাস্তার ওধারে হঠাৎ-বড়লোক ঘোষবাবুদের নতুন লাল বাড়িটা ছাড়া নিকট প্রতিবেশী কেউ নেই আর। ঘোষবাবুদের ছোট ছেলে করুণাসিন্ধু অবশ্য মাঝে মাঝে করুণা বৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু নানা কারণে সেটা পছন্দ করতে পারে না ভূপতি, তার স্ত্রী বিভা এবং বিভার ছোট বোন প্রাইভেটে আই-এ পরীক্ষার্থিনী আভা।

পড়শীকে হাঁক-ডাক করতে হলে অবশ্য করুণাসিন্ধুকেই ডাকতে হয়। কিন্তু—

ডাকলে তারও কি এখন সাড়া মিলবে? খানিকক্ষণ কান পেতে শুনল ভূপতি। টিনের চালের ওপর বৃষ্টির ঝিমঝিমে আওয়াজ। বাইরের আমলকি গাছটার শিরশিরানি। পেছনের ডোবায় ব্যাঙের আনন্দধ্বনি।

ঘর ছেড়ে ওই মোটা মোটা কোলা ব্যাঙগুলোর সন্ধানে কেন যায় না সাপটা? ভূপতির মনে কূট জিজ্ঞাসা উদিত হল। বিভা চেঁচিয়ে উঠল: কী আশ্চর্য, একেবারে পাথর হয়ে বসে রইলে যে! কিছু একটা করো। মারা যাব নাকি সাপের কামড়ে?

—কী হয়েছে দিদি? তখন থেকে সমানে চেঁচামেচি করছিস কেন?—দরজার বাইরে আভার গলা পাওয়া গেল। পাশের ঘর থেকে এতক্ষণে টের পেয়েছে আভা, উঠে এসেছে।

বিভা আর্তস্বরে বললে, ঘরে সাপ!

—কী সাপ?

ভূপতিই জবাব দিলে। নিজের অজ্ঞাতেই এক পোঁচ রঙ্ চড়িয়ে ফেলল বিভার বর্ণনায়: মস্ত খরিশ। পাঁচ হাত লম্বা।

—তাতে কী হয়েছে? দাঁড়াও—আমি লাঠি নিয়ে আসছি—

দুপ দুপ করে আভার চলে যাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল।

গরীব বোনের গলগ্রহ, দুবেলা খেতেও পায় না পেট পুরে। তারপরে আছে একটা এম-ই স্কুলের ঘাড়ভাঙা চাকরি। তবু আশ্চর্য সতেজ আর সুস্থ এই আঠারো-উনিশ বছরের মেয়েটা। আরো আশ্চর্য, আভা রূপবতী। এই বিবর্ণ বিষণ্ণ আনন্দ থেকে কেমন করে এমন প্রাণ আর স্বাস্থ্য কে আহরণ করে, কে বলবে!

একটু পরেই দরজায় বাঁশ ঠোকার শব্দ। আভা অস্ত্র সংগ্রহ করে এসেছে।

—দরজা খোল্ দিদি।

—খাট থেকে নামতে পারছি না যে!—বিভার হতাশ আর্তনাদ: তলাতেই কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। নীচে পা দিলেই যদি ছোবল মারে—

—বুঝেছি।

ওপাশ থেকে ধাক্কা দিতেই কপাটের জোড় একটু ফাঁক হয়ে গেল মাঝখানে। তার ভেতরে আঙুল চালিয়ে ভেতরের খিলটা খুলে ফেলল আভা। এ বাড়ির ঘর-দরজা সবই তার নাড়ী-নক্ষত্রে জানা।

এবারে নড়েচড়ে উঠল ভূপতি।

—এই আভা—কী হচ্ছে ওসব পাগ্‌লামি! মস্ত বড় সাপ। বরং পাড়ার লোকজন ডেকে—

—একটা সাপ মারবার জন্যে সাত পাড়া জড়ো করতে হবে তুমি পুরুষ মানুষের নাম ডোবালে ভূপতিদা—

দরজা ঠেলে সদর্পে আভা ঢুকল। গাছকোমর বাঁধা—হাতে একটা বাঁশের টুকরো।

—আভা, মুখপুড়ী—সর্বনাশ করবি তুই!—তারপরে বিভা ককিয়ে উঠল: বেরো—বেরিয়ে যা ঘর থেকে—

কিন্তু সে সব শোনবার পাত্রী আভা নয়। ততক্ষণে সে উবু হয়ে খোঁচা দিয়েছে খাটের তলায়। বিভার একরাশ হাঁড়িকুঁড়ি ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল, তারপরেই ফোঁস করে একটা হিংস্র আওয়াজ!

বিভা পৈশাচিক আর্তনাদ তুলল, ভূপতির গলা দিয়ে বেরুল খানিক অর্থহীন জান্তব ধ্বনি! তারপরেই তক্তাপোশের আর একপ্রান্তে খোলা জানালা বেয়ে আবির্ভূত হল একটি নিকষ কালো গোখরো সাপ। লণ্ঠনের আলোয় তার চক্রাঙ্কিত ভয়ঙ্কর সুন্দর দেহটা ঝিকমিকিয়ে উঠল।

মাঝখানে চৌকির ব্যবধান, আর তার ওপরে বসে সমানে চীৎকার করছে স্বামী-স্ত্রী। আভা খানিকক্ষণ যেন হতভম্ব হয়ে রইল তারপর চৌকির পাশ ঘুরে সাপের গায়ে আঘাত করার আগেই জানালার বাইরে সেটা নেমে গেল আগাছা-ভরা ছাইগাদার ভেতরে।

আভা ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, পালালো! চেঁচিয়েই তোমরা সব মাটি করে দিলে। নইলে—

এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এসেছে বিভার। সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে বললে, খুব হয়েছে—থাম্! মেয়ের কী দুঃসাহস বাবা যে সাপের চেহারা দেখে জোয়ান মানুষের বুক কাঁপে, একটা ভাঙা

য়, উনি তাই মারতে গেছেন। যদি ফস্‌কে যেত—তাহলে!

ফসকাত না।

নাঃ, ফসকাত না। মস্ত এক লাঠিয়াল এসেছেন উনি! যা—

রে গিয়ে শো, খুব বাহাদুরি দেখানো হয়েছে!

ওঃ, ভাল করলাম কিনা? নিজেরা তো ভয়ে হার্টফেল করার

হয়ে ছিলে!—ক্ষুণ্ণ বিষণ্ণ মুখে আভা বেরিয়ে গেল।

কটা বুক-চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে ভূপতি এতক্ষণে বিড়ি ধরাতে

ধীরে সুস্থে।

-উঃ, এক নম্বরের ডাকাত হয়েছে মেয়েটা!

—ডাকাত বলে ডাকাত! ও দরকার হলে মানুষ মারতে পারে!

ভা সায় দিলে। তারপর পড়ল ভূপতিকে নিয়েঃ তবু তো

এসে সাপটা বের করে দিলে ঘর থেকে। আর তুমি পুরুষ

হয়ে—

বারে, আমি কী করব। ঘরের বাইরে থাকলে আমিও—

—ঢের হয়েছে, চুপ করো! আর তোমাকে আমি বার বার

নি, আস্তাকুঁড়ের ওদিককার জানালাটা খুলে রেখো না? খানা-

ল ঝোপ-ঝাড় আছে, চাই কি চোরে হাত বাড়িয়ে গলার

-টারও টেনে নিতে পারে। তা বাবুর গরম লাগে! এখন হল

? বাদ্‌লা পেয়ে সাপ এসে ঢুকেছিল, যদি আমি ঠিক সময়মতে

র না পেতাম, তা হলে—

বিভার আত্মস্তুতি শেষ হল না। তার আগেই বাইরের বারান্দা

তোর শব্দ শোনা গেল, আর তার সঙ্গে এল ভরাট গলার ডাক

পতিবাবু—ভূপতিবাবু—

বিভা ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, করুণাসিন্ধু।

ত্রস্ত উঠে পড়ল ভূপতি, কাপড়ের কষিটা বেঁধে নিয়ে সশব্দে বাইরের দিকের দরজা খুলে দিলে।

—আসুন—আসুন—

গায়ে বর্ষাতি ফেলা, হাতে বন্দুক—নাটকীয়ভাবে করুণাসিন্ধু প্রবেশ করলে। ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে বসল বিভা। লোকটার চাউনি ভালো নয়, মদও খায় এক-আধটু, গায়ে পড়ে আলাপ করতে চায়। কিছুদিন থেকে কারণে অকারণে বড় বেশী খোঁজ করছে সে। বিভার মনে একটা গভীর সন্দেহ জেগেছে, অত্যন্ত বিব্রত হয়ে উঠেছে ভূপতিও।

বন্দুকটাকে বাগিয়ে ধরে করুণাসিন্ধু বললে, সাপ-সাপ বলে চীৎকার শুনলাম। ভাবলাম, বন্দুকটা হয়তো কাজে লাগতে পারে, তাই এলাম। তা কোথায় সাপ?

—সে আর নেই। বাইরে পালিয়েছে।—ভূপতি জবাব দিলে: তবু আপনি যে কষ্ট করে এসেছেন, সেজন্যে অনেক ধন্যবাদ!—বিভার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিভরে যোগ করল: তা এলেন যখন, বসুন না একটু। দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

এরপরে ভদ্রতার খাতিরেই করুণাসিন্ধু বিদায় নেবে এমনি একটা আশা ছিল ভূপতির। কিন্তু আশাটা ব্যর্থ হল। একটা চেয়ার নিয়ে জমিয়ে বসল করুণাসিন্ধু।

—এই সময়টা বড় খারাপ, সাবধান থাকবেন। কোনো দরকার পড়লেই ডাকবেন আমাকে।—একটা সোনার সিগারেট কেস্ বের করে সেটা এগিয়ে দিলে ভূপতির দিকে: হ্যাভ্ ওয়ান?

—নাঃ, বিড়ি নইলে আমাদের নেশা জমে না—বিভার কুণ্ডলী-পাকানো চেহারার দিকে আবার আড় চোখে তাকিয়ে শুকনো গলায় ভূপতি জবাব দিলে।

টে। আপনারা আবার কড়ার ভক্ত।—বিড়ির দীনতাকে
প দিয়ে ঢেকে দিলে করুণাসিন্ধু: যার যা।
হাঁ।
সিগারেট ধরিয়ে একবার কাশল: যা বলব
ভালো কথা ভূপতিবাবু, আপনার শালী বোধ হয়
ন আজকাল?
বার নড়ে উঠল। সভয়ে মাথা নাড়ল ভূপতি।
বলে চলল, ক'দিন থেকেই বলব ভাবছি। আমাদের
অফিসে শ' দেড়েক টাকা মাইনের একটা ভেকান্সি হচ্ছে
যদি বলেন, ঢুকিয়ে দিই ওকে। আমার হাতেই

ন কি—দেড়শো টাকা! এ যে এম-এ পাশের মাইনে!
ম্যাট্রিক পাশ!
বাবাকে বললে সবই হয়ে যাবে।—করুণাসিন্ধু করুণায়
য়ে পড়ল: আপনারা আমাদের প্রতিবেশী, যদি কিছু
রতে পারি, নিজেকেই ধন্য মনে করব।—করুণাসিন্ধু এবার
ল: কাল যদি আমার সঙ্গে একবার ওকে কলকাতায়
ন—
ছাইগাদার ওপরে ধপ্ ধপ্ করে আওয়াজ হল গোটা দুই।
চমকে গেল: ও কি! কে ওখানে?
আভা, ভূপতিদা!
অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে বিভা আর্তনাদ ছাড়ল:
এই অন্ধকারে ওখানে গেছিস কেন? চলে আয়—শিগ্গির

—আসছি—আমার রণাঙ্গণ, কর্কেটটা বন্দুক আওয়া
—সর্বনাশ করবে, ও আমার সর্বনাশ করবে।—বিা
বেলল : ডাকাতটা ওখানে এই অন্ধকারে সাপ খুঁজতে গেছে

—অ্যাঁ—সাপ খুঁজতে গেছেন।—করুণাসিন্ধু লাফিয়ে
অসম সাহস ওঁর।—বন্দুকটা তুলে নিয়ে বললে, যদি আ
সাহায্য করতে পারি—

—আভা—আভা।—ভূপতি হুঙ্কার ছাড়ল।

—আসছি ভূপতিদা—

করুণাসিন্ধু আভার উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে যাচ্ছিল—কিন্তু
কাছে গিয়েই আতঙ্কে পিছু হটে এল। একহাতে টর্চ, আ
হাতে লাঠির মাথায় কালো কুচকুচে গোখরোটার মৃতদেহ
নিয়ে ঘরে ঢুকেছে আভা। সাপটার ঝুলে পড়া থ্যাঁতলা
থেকে সুতোর মতো আঠালো লালা গলে পড়ছে।

সুন্দর গালে কাদার ছিটে, ভিজে চুল বেয়ে জলের ফোঁটা
একটা অদ্ভুত বন্য আলোয় জ্বলছে আভার চোখ। তীক্ষ্ণ হাসি
বললে, কেমন দিদি, তুই যে বলেছিলি সাপটা আমি মারতে পার

পাথরের মতো দৃষ্টি মেলে স্তম্ভিত ভূপতি আর বিভা যেখানে
ঠিক সেইখানেই বসে রইল। আর আভার চোখের বন্য আলো
ছিল কে জানে—হঠাৎ পাংশু হয়ে নিবে গেল করুণাসিন্ধুর মুখ।
দণ্ডায়মানেই সে দ্রুতবেগে ঘরের বাইরে ছিটকে পড়ল, ক্ষিপ্রগ
নেমে যেতে যেতে ডাক দিয়ে বললে, চলি ভূপতিবাবু, আ
তাহলে বিশ্রাম করুন।

সমাপ্ত